

নেপাল থেকে

সঞ্জয় সেন



মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
গ্রন্থণ
দীননাথ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬।

ভূমিকা

বইয়ের পরিচয় দেওয়ার আগে লেখকের পরিচয় একটু দিয়ে রাখা দরকার। লেখক বাঙালী হলেও বাংলাদেশের লোক নয়, যতদূর জানি সাহিত্যের আসরেও বই হাতে করে তাঁর এই প্রথম প্রবেশ।

প্রায় পাঁচশতাব্দীর কথা। একজন তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ নিজের অলৌকিক শক্তিবলে নেপাল রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হন এবং স্থায়ীভাবে পুরাণবিশ্রুত জনকপুর ধামের নিকট একরাহী নামক স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনিই সঞ্জয় সেনের পূর্বপুরুষ। ক্রমিক ঊর্ধ্বতম পঞ্চদশতম পর্যায়ভুক্ত। এঁদের আদি বাস পাবনা জেলা।

নেপাল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা সমাপ্ত করে লেখক নেপাল সরকারেই চাকুরি আরম্ভ করেন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতায় সুবা অর্থাৎ জেলাম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে ধাপে ধাপে উঠে নেপাল স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একজন সচিবের পদ অলঙ্কৃত করেন। বাঙালীর মধ্যে এ কৃতিত্ব আর কেহ অর্জন করেছেন কিনা আমার জানা নেই। আমি সদ্য পাস করে এখানকার এক স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছি—লেখক ছাত্র হয়ে এলেন। অসাধারণ মেধাবী বালক, মনে একটা ছাপ রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর জীবনে আর ঘনিষ্ঠ যোগ হওয়ার সুযোগ হয় নি। তারপর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে আমার আবার এই যোগাযোগ ঘটল বলা চলে। তাঁর বইয়ের পাণ্ডুলিপিখানি হাতে করে এলেন লেখক এবং আমায় বিস্মিত ও পুলকিত করে দিলেন।

বাংলাদেশ থেকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সে যুগের নেপালে প্রায় জীবনটা কাটিয়ে বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের সঙ্গে তিনি যে এমন নিবিড়ভাবে যোগ রক্ষা করে গেছেন, অত দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও, এতে সত্যিই বিস্মিতই হতে হয়।

প্রথমেই যা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল তা তাঁর লেখার ভঙ্গিটি। সহজ কথায় হালকা গতির একটানা স্রোতে এগিয়ে চলেছে লেখা, পাকা হাতের রাঁধুনি। বিষয় বস্তুর কথা বাদ দিলেও শুধু মিষ্টিভাষার মাদকতাই মনটাকে

টেনে নিয়ে যায়। বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে আবাল্য নিজের জীবনকে অবলম্বন করেই বইখানি লেখা হলেও আত্মজীবনীর অংশটুকুই এতে প্রধান হয়ে ওঠে নি এবং এইটিই বইখানির বিশিষ্টতা। নিজেকে অন্তরালে রেখে নিজের জীবনের ভূয়োদর্শনকেই তিনি প্রাধান্য দিয়ে গেছেন এবং সে ভূয়োদর্শন যে নানা বৈচিত্রে সমৃদ্ধ, একথা বলাই বাহুল্য। এর খানিকটা বাংলাদেশ নিয়েই, সেখানে শিক্ষাব্যপদেশে একটা অংশ তাঁকে বাংলাতে কাটাতে হয়েছিল। জীবনের এ প্রান্তে এসে তাঁর সেই সময়ের স্মৃতিচিত্রগুলি যে নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন, তা সত্যিই মনোজ্ঞ। কিন্তু বাঙালী পাঠকের কাছে এ পুস্তকের আসল মূল্য অন্যদিক দিয়ে—নেপাল। হিমালয়ের কোলে হিন্দুর পুরাতন ঐতিহ্য বক্ষে ধারণ করে এই একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য আমাদের মনে চিরদিনই একটি শ্রদ্ধা এবং গৌরবের ভাব জাগিয়ে রেখেছে কিন্তু নানা কারণেই এর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অগভীর। এবং ঠিক এই জন্যই একটি রহস্যের ভাবও থেকে গেছে মনে। পুরুষানুক্রমে নেপালের একজন স্থায়ী অধিবাসী তথা ব্যক্তিগতভাবে নেপাল দরবারে একজন পদস্থ কর্মচারী হিসাবে নেপালের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ভূগোল ইতিহাস রাজনীতি সমাজনীতি সবক্ষেত্রেই খুব ঘনিষ্ঠ। এরই অনেকখানি তিনি বইখানির মধ্যে ধরে দিয়েছেন এবং বাঙালী পাঠকের কাছে বইখানির আসল মূল্য সেখানেই। এ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা প্রসঙ্গক্রমেই এসে পড়েছে; কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, তাই প্রচারের ভাব এসে না পড়ে, বেশ সহজ সঙ্গতভাবেই কাহিনীর সঙ্গে মিশে গেছে।

তবে আমার মনে হয় লেখকের প্রত্যক্ষদর্শনের যে অভিজ্ঞতা তাতে এ দিকটা আরও বিস্তৃত এবং পরিপুষ্ট করলে ভালো হোত। রাজার স্বীয়রাজ্য পরিদর্শনের যে একখানি অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক, প্রায় পৌরানিক সমারোহের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র, তাতে এই লোভটা আরও বেড়ে যায়।

'নেপাল থেকে' মোটের উপর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হয়েছে আশা আছে বাঙালী পাঠক এর সমুচিত মর্য্যাদা দেবে।

দ্বারভাঙ্গা। **শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়**

অজস্র গ্রন্থপ্লাবিত বাংলা দেশে কোন একটি নতুন অভিনব গ্রন্থের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব এবং পাঠক কর্তৃক তার রসসম্ভোগ তার ভাগ্যের কথা। অধুনা মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় যে-কোন লেখনী-সঞ্চালনই গ্রন্থ নামে পরিচিত। বিশেষ করে ভ্রমণ ইত্যাদি সংক্রান্ত রম্যরচনা জাতীয় বইগুলি তো হৈমন্তিক পতঙ্গের মতো বাংলা সাহিত্যের সান্ধ্য বাসর ছায়াচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যখন লেখকগণ কল্পনার পাখায় ভর করে ভারতের দিগ্‌দিগন্তে কল্পবিহার করছেন এবং পাঠকেরাও সেই সমস্ত বাললোভন মোদকখণ্ডকে অমৃতখণ্ডবৎ সাগ্রহে গলাধঃকরণ করছেন, ঠিক তখনই শ্রীযুক্ত সঞ্জয় সেন রচিত 'নেপাল থেকে' হাতে এল।

বিস্ময়রস রোমান্সের প্রাণধর্ম। কিন্তু বাস্তব দেশ-কালও যে অনুরূপ বিস্ময়রসের একটি অনাস্বাদিতপূর্ব কল্পকথারূপে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে, তা এই বিচিত্র গ্রন্থ থেকে বোঝা যাবে। আমাদের রসের অসাড়তা এর দ্বারা যে অনেকটা ঘুচে যাবে, এই আমাদের পরম লাভ।

শ্রীসঞ্জয় সেন নতুন লেখক, কিন্তু নবীন ব্যক্তি নন। জীবনের ঘটনাবহুল বহু উচ্চাচ্চ পথ পার হয়ে যখন প্রসন্ন অবসরকালের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব স্বীকারোন্মুখ হয়েছিলেন, তখন সরস্বতীর শ্বেতহংসের পক্ষবিধূনন তাঁকে গ্রন্থরচনায় উদ্বুদ্ধ করল। কর্মোপলক্ষে দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা নেপাল প্রবাসী। নেপালের সমাজ, রাজনীতি, দৈনন্দিন জীবন, ভাষা, আচার-ঐতিহ্য তাঁরও অন্তরের সামগ্রী। অনেক দিন ধরে নেপাল সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি জীবনে যে সমস্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, অপূর্ব ভাষাভঙ্গিমায় সেই নেপালকে তিনি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন। নেপাল আমাদের প্রতিবেশী, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে একসময় নেপালের সংযোগ ছিল গভীর। তুর্কী আক্রমণের পর বহু বাঙালী পণ্ডিত নেপালে চলে গিয়েছিলেন নিরাপদ

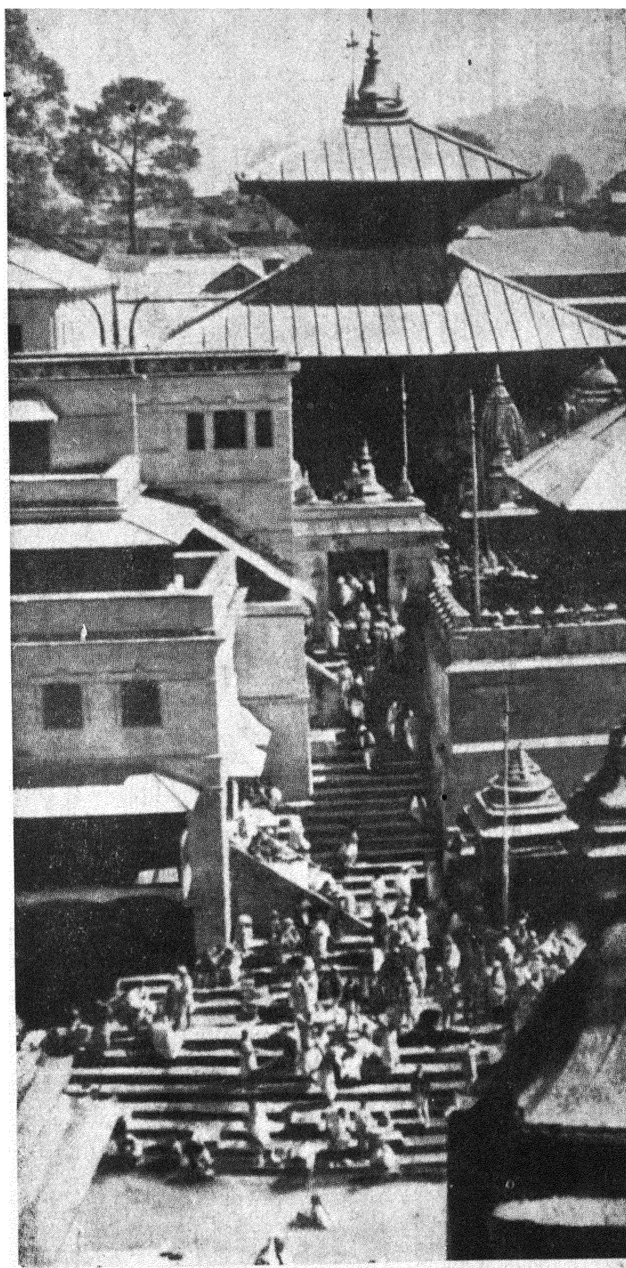
বাসস্থানের আশায়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম রচনা 'চর্যাগীতিকা' নেপাল থেকেই পাওয়া গেছে। কবি বিদ্যাপতিকেও রাজনৈতিক সঙ্কটে নেপালের উপান্তভূমিতেই আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয়েছিল। অথচ এই প্রতিবেশী-রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয় টুরিস্ট অফিসের মারফতে, নতুবা সাময়িক পত্রের রাজনৈতিক ভাষ্যে।

শ্রীযুক্ত সঞ্জয় সেন রহস্যাবৃত শৈলপুরী নেপালকে আমাদের যেন দ্বিতীয় বাসভূমি ছেপে তুলে ধরেছেন অসাধারণ কলাকৃতির সঙ্গে। গ্রন্থের প্রথম দিকে তাঁর ব্যক্তিগত বাল্যকৈশোর জীবনে স্বপ্নসঞ্চরণ আমাদেরও স্বপ্নাভিসারের দূর বিসর্জিত লোকে নিয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গুণ—তা সীমাবদ্ধ, ব্যক্তিগত ও বিশেষ কালচিহ্নিত হয়েও 'সাধারণী করণের' দ্বারা সর্বজনমনোহর হতে পারে। লেখক রহস্যকৌতুকের অম্লাক্ত ছিটেফোঁটা দিয়ে কখনও নিজের কথা, কখনও নেপাল ভূমির কথা, কখনও গিরিদরী-নদনদীর কথা চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর হাতে আছে মরালবাহনা বাগ্দেবীর আশীর্বাদপূত লেখনী, জীবনে আছে নানা অভিজ্ঞতার সমারোহ, আর মনে আছে রঙ্গকৌতুক-উতরোলেপ্রসন্ন বাঙালীত্ব। তিনি দীর্ঘকাল নেপালপ্রবাসী হয়ে সেই দেশকেই নিজের আত্মীয় বলে জেনেছেন; আবার বাংলার সঙ্গেও সুগভীর প্রেমের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। সেই সমস্ত সুখদুঃখের কথা, আনন্দের কথা, বেদনার কথা—ছোট বড় কত লোকের ছায়াছবিকে তিনি কায়ারূপ দিয়েছেন। এই মজলিসী ঢং, জমাট রসিকতা, প্রচ্ছন্ন রঙ্গব্যঙ্গ তথ্য ও তত্ত্বকে যে কী বিচিত্র শিল্পরূপ দিতে পারে, তা পাঠকেরা নিজেরাই এই গ্রন্থ থেকে উপলব্ধি করতে পারবেন।

বাংলা সাহিত্যের আসরে এই প্রবীণবয়সী নবীন আগন্তুককে আমি বাঙালী পাঠকের পথ থেকে অভ্যর্থনা জানাই। ইতি

শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমান্ শৈলেন মজুমদার
কল্যাণীয়েষু



৺পশুপতিনাথ মন্দির—হিন্দুদের পরমআকাঙ্খিত তীর্থ,
আলোকচিত্র— মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কাঠমাণ্ডু

পদে পদে

পরিচয়ের

কাঁচা কড়চা

'পোড়াবাড়ি', স্টিমার ভিড়ল। কার বাড়ি, পোড়ে কবে, কেউ জানে না। ছাই গেছে উড়ে, যেদিকে তাকাই শুধু বালু ধু ধু। আমি আর ছোটমামা, ঘোড়ায় আগু পিছু চেপে মামার বাড়ি এলাম। গাছে থোকা থোকা আম। মামার বাড়ি ঢুকতেই আমি দেখি, মগডালে পাকা আম, ঝট্‌পট্‌ গাছে চড়ে পড়লাম।

দিদিমা নাতি খুঁজছেন, মামা হাঁক পাড়েন। উপর থেকে ভাগ্নের জবাব পেয়ে মামা তো অবাক, কী ছেলে! কেন বাড়াবাড়ি হয়েছে? বল্‌ছো—বাচ্চা ছেলে, এল কোন্ সুদূর নেপাল থেকে, বাংলার মাটি ছুঁলো কি ছুঁলো না, ঘোড়ার পিঠ হতে একেবারে গাছের ডগায় প্রমোশন! কে না তাজ্জব মানে?

—শোনো, আমটা পাকতে কসুর করে না, রূপে রসে টলমল। সে ঐ ডালে ঝুলে থাকবে বলে, না তোমার হাতে আসার জন্যে?

মগডালে আম, হাত লাগাতে উঁচুতে উঠতে হয়, এতে নেপাল আর বাংলা কি?

বাড়িতে পড়ান বরিশেলে পণ্ডিতমশাই। বিলিতি ছোঁবেন না, তাঁতের মোটা কাপড় পরেন, গুড়ের খাবার খান। নির্ভিক পরোপকারী দেশসেবক।

পল্লীজনের আনন্দ উৎসবে চলে, গভীর রাত অবধি যাত্রা গান। পালা শেষে সোজা পথে শ্মশান হয়ে বাড়ি এলাম, পণ্ডিতমশায়ের

সঙ্গে। নিশিগহীনে মশানে নির্জনে, কৈশোরে অর্জিত সে জ্ঞান, আমার সাহসিকতার পরম সহায়।

মামার সঙ্গে রাতের পড়া। পড়া বলে, ছুটি পেয়ে আমি দিদিমার কাছে গল্প শুনি, মামা নামতা আউড়ে ঢুলে ঢুলে, অবশেষে উবু হয়ে নিদ্রা যান।

খাবার ডাক পড়ল—কিরণ, ওঠ্ ।

—এক কড়া পোয়া এক গণ্ডা, দুই কড়া আধ গণ্ডা······

—খেতে চল্।

আবার কড়াকিয়া আরম্ভ হোল, আর তা অসমাপ্ত রেখেই মামা চুপ সাধেন। আমি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পিঁড়েয় দাঁড় করিয়ে দিই, মামা বসে খাও।

বুঝলেন কি, জানেন তিনিই, ঠায় দাঁড়িয়ে কাপড় ভিজোচ্ছেন। মামা একটা মিছে কথা বলে সারতে পারেন না, ধরা পড়েছেন। পণ্ডিতমশাই রসগোল্লা খাওয়ালেন আমাকে, বঞ্চিত মাতুল সামনে দাঁড়িয়ে দেখবেন তা, অভিনব শাস্তির ব্যবস্থা।

নীচেই নদী, পাশে খাল, বাড়িটা পাড়ার বাইরে লোকালয় থেকে দূরে, ছুটিতে বাড়ি এসেছেন দাদামশাই।

নিশুতি রাত, দম্‌কা বাতাসে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, দোর হাট্ খোলা। ঘরে কি চোর এল, আলো জ্বালেন, আমার বিছানা খালি। আতঙ্কে হাঁক-ডাকে, নদীর বাঁকে খাল থেকে সাড়া আসে। অতটুকু ছেলের সাহস দেখ!

বয়স বাড়ছে। কাবাডি খেলতে, গাছে চড়তে, সাঁতার কাটতে, নৌকো বাইতে, আমার জুড়ি তল্লাটে মেলা ভার। আমি মানানসই দলের সর্দার।

ছ'আনি বাড়ির বুড়ি কড়া লোক, অথচ তারই ঝাড়ে ছিপের বাঁশ। সদলে চুপিসাড়ে সরাব, বুড়ির ঠিক নজর পড়েছে। পণ্ডিতমশাইর

অমোঘ শাসন। আমায় কিন্তু দিনভোর খেতে না দিয়ে বেঁধে রেখে স্বীকার করানো গেল না—অন্যায় করেছি, ক্ষমা চাই। এমনই নেপালীধাত একরোখা ছেলে।

কচুগাছের কালীপূজোয় কচুর পাঁঠা বলি, সাথী আমার ডানকব্জির নিচে ঘা বসিয়ে দিলে। বাড়িতে কেউ জানে না, সে দাগ মিলিয়ে যাবার নয়, আজও মুছে যায় নি।

সখ আছে রকমারি। দিদিমা—শোবার ঘর গোছাতে এসে ঘরের কোণে আবিষ্কার করলেন মুখঢাকা হাঁড়ি। ঢাকনা সরাতে গুটিকয়েক ব্যাং লাফিয়ে পালাল। পরে যা বেরিয়েছে সাংঘাতিক তা, সাপ পোষা হচ্ছিল।

পুতুল নাচ দেখে, পুতুল নাচিয়ে, স্কুলে সম্মোহন করা দেখে একটি ছেলেকে সম্মোহিত করে, তাক্ লাগাই। পড়াশুনা কসরৎ আবৃত্তি সকল বিষয়ে সবার আগে আমার স্থান। মাস্টারমশাইরা কি ভালই না বাসেন আমাকে। পালপার্বণে উৎসব উপচারে আপদে বিপদে সকলের সে অবাধ মেলামেশা, আত্মীয়তার পরশ আর নেই। সে প্রাণ প্রাচুর্য, সে নির্ভরতা লোপ পেয়েছে, বঙ্গলক্ষ্মী কালের চাপে হতশ্রী দিশেহারা।

'বিশে' চাকর মুসলমান, রাত্রে আমার কাছে বাল্যশিক্ষায় পড়ে রসশালী দ্রীর্ঘালী। উর্বর জিবে উচ্চারণ, হোঁচট খায় বিষম, কড়া হাতে পেন্সিল ভাঙ্গে হরদম। সাপের মন্তর শিখতে গরজে আমাকে কাঁধে করে ভিনগাঁয় গুণীর বাড়ি নিয়ে যেত রাত্তিরেই। আমি মন্তর লিখে, পড়ে শোনাই, সে মুখুস্ত করে—আইনাগ মণিনাগ বিষ নাম্বি তো নাম, আজ্ঞা খেতুরের সাঁই, কামিখ্যের দোহাই—বিষহরিকে ডাকাডাকি।

বিশে-দা দল বেঁধে নৌকো চড়ে পাহাড় অঞ্চলে কাঠ আনতে যায়, বাঘের ভয়ে মাঝ দরিয়ায় নৌকো বাঁধা। জ্যোৎস্নার আলোয় রান্না

চেপেছে, আলো জ্বল্‌লে পোকা আসে।

ডাল ভাত খেতে খেতে করিমতুল্লা বলে—বিশে-দা ভারি চালাক, লুকিয়ে ডালে আম্‌সি দিয়ে খায়, জানতেও পারি না।

—হ্যাঁ, আম্‌সি আবার কোথায়, দেখি।

কালো একটা কি তুলে ধরেছে। আলো এলে দেখা যায়, ডালময় জোঁক। অন্ধকারে নদীর জল তুলে ডালে ছেড়েছিল। দেওপুরের কালী জাগ্রত দেবতা। দিদিমারা নৌকো চেপে পূজো দিতে যাবেন, সঙ্গে বিশে-দা আর আমি। ফেরার পথে সন্ধ্যা হতে, এক গেরস্ত বাড়ির ঘাটে নৌকো বাঁধা হোল। মুসলমান তারা, আদর করে মেয়েরাই অতিথিদের ঘরে তুলে নিল, পুরুষেরা বাড়ি নেই।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বিশেদার হন্তদন্ত ভাব, কৌশলে সবাইকে নৌকোয় তুলে অবিলম্বে পাড়ি জমায়। জানালো, ডাকাতের বাড়ি ওটা, পুরুষরা এসে আমাদের সর্বস্বান্ত করতো, খুব বাঁচা বাঁচলাম।

এরও বিপরীত দেখেছি, বাঙ্গালী গেরস্তের অতিথি দেবতা। দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজো, রাস, রথ, চড়কের মেলা, যাত্রা কীর্তন কথকতায় আমার বাল্যজীবন সুখময়। বিদ্যালয়, পাঠাগার, হাসপাতাল, দেবালয়, অতিথিশালা, টোল, ঘাটেবাটে খালেপোলে বাঙ্গালীর বদান্যতা, বাংলাকে করে সম্পন্ন, করেছে সমৃদ্ধ।

শ্রাবণ সন্ধ্যায় দিদিমার সঙ্গে ও পাড়ায় 'মনসামঙ্গল' শুনতে যাই। বাড়িতে একা রইল অক্ষয়ের মা, কানে কম শোনে, সে যাবে না। বাড়ি বাড়ি দোরে শেকল তুলে দিয়ে চলে যায় সব, চুরির ভয় নেই। ঝি অক্ষয়ের মা, খাতির কম নয় তার, সমীহ করে চলি। লোক ভাল, আমাদের যত আবদার তার কাছে, ফরমাসমত গল্প শোনায়, সেও ছিল আমার এক দিদিমা, রূপকথার জাহাজ।

হাটে কেনা মাছ খালুই ভরে নদীতে ধুতে গেলে, আমাদের ডাক

পড়বে। লণ্ঠনের আলোয় তিন কাঁটাওলা সুস্বাদু মাছের ঝাঁক, মাছ ধোবার সময় কিলবিল করে হাজির হয়, মামা ভাগ্নেয় গামছা ভরে মাছ তুলেছি।

ছুটির দিনে বন্ধুরা মিলে যাত্রাগানের আসর বসে—রাবণ অবিনাশ, লক্ষ্মণ আমি, নতুরাম। তুমুল সে রণ, ধরাশায়ী রাবণ, ধর লক্ষ্মণ শান্ত এখন। রঘুবীর বীরবর, রাগ যায় না তার, ধনুকে প্যাঁকাটির তীর টেনে বক্তৃতা ঝাড়ে অনর্গল। যেমন তার ধার, তোড় কী ভীষণ! করুণ নয়ন মেলে রাবণ, ত্বরিতে তীর ছুটে, বিঁধলো গিয়ে চোখে। ওরে বাবারে, মলামরে—বিকট চিৎকার রাবণের, রাম লক্ষ্মণ সবেগে পালায়। বিষাদময় স্মৃতি তার, মনকে আমার আজও পীড়িত করে।

স্কুল থেকে ফিরছি, চিন্তায় বিহ্বল মন। মস্ত নদী, মাঝে ভাসে গাদাবোট, তারপর বাড়ি বাগান করে সুখেই ছিলাম। খেয়াল হোল —ছাতা কৈ?

পথ অনেকটা, ফিরে গিয়ে ক্লাশে ছাতা খুঁজি। চাপরাসী ঘর বন্ধ করবে, এসে বলে—খোকাবাবু, ফিরে এলে যে?

—হরিদা, ছাতা ফেলে গেছি, দেখেছো?

তোমার কাঁধের পিছনে কি বটে ওটা?

পিঠের 'পর ঝোলানো ছাতা, লজ্জায় লাল হয়ে বাড়ি ফিরি। ফন্দি খেলতো মাথায়।

বাগান করি বাসনা। খোঁজাখুঁজি করে ফুলের চারা জোগাড় হোল, পরিশ্রম করে গুছিয়ে বাগান সাজাই, গরুতে খেয়ে যায়। কচি ঘাস দেখিয়ে ভুলিয়ে, গরুর লেজে বেঁধে দিলাম শুক্‌নো এক আঁটি নাড়া খড়। আর তাকে পায় কে? যত ছোটে, খড় করে খড়খড়, পরিত্রাহী মাঠের পর মাঠ পেরোতে লাগল।

পূজোর মুখে দিদিমার বাপের বাড়ি থেকে নৌকো নিয়ে এল পলানদা, দিদিমার সঙ্গে আমিও যাব, মহা আনন্দ।

পলানদা মাননীয় অতিথি, আদরে আপ্যায়িত হয়ে আহারান্তে নিদ্রা যাচ্ছে, বিকেলে আমাদের নিয়ে নৌকো ছাড়বে। পিঠুলি ফলের লাটিম ঘুরিয়ে ছেড়ে দিতে, পলানদার দাড়িতে জড়িয়ে গোল পাকালো। বাপ্ বাপ্ করে উঠে বসেছে।

আমি দে পিঠটান্।

এ মস্করার দরুণ দিদিমার মুখে অঝোরে গঞ্জনা ঝরে, যুগপৎ বিজুরি-ঝলসে। যে হাসি তিনি হাসলেন, বল, সে কাহার জন্য ?

মাথা ছাঁটায় হাত পাকাতে কাঁচি একটা পেলাম কিন্তু চিরকেলে সেই—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। মাথা দিতে চায় না কেউ, উল্টে কাঁচি কাড়বে, ভয় দেখায়। যাক্, অসাধ্য সাধন হয়, সেধে ভজিয়ে। নিরীহ এক যজমান জুটলো, চুল ছাঁটলে চেহারায় চমৎকার জৌলুষ বাড়ে, নানা নমুনা দেখিয়ে পটালাম।

লোকচক্ষুর আড়ালে, কাঁচি যথেচ্ছ চলে। বেচারীর অজান্তে মাথার যা দুর্দশা করে ছাড়ি, সে বাবদে লাঞ্ছনা বরাতে বর্তালে, বারণ মানে কি ? এবে ন্যাড়া মাথা ধরে, সেই ধন্য ধরাপরে। কৃতার্থ করে মোরে, ছাঁটার কায়দা হয় রপ্ত।

ছুটিতে যাব বাড়ি, স্টেশনে হুইলারের দোকান, ছুরি কলম ঘড়ি কাঁচি সব আছে। মামা ঘড়ি আর ছুরি কিনে দেন, আমি চেয়েছি। গাড়িতে বসেই ঘড়ি খুলে ফেললাম। অস্ত্রের আঘাতে ঘড়ি নীরব হতে, বেশ খরচ করে মামা মেরামত করালেন। উপর্য্যুপরি ছুরিকা-ঘাতে চলার সামর্থ্য নেই তার, চলে না। তবে আমি এখন ঘড়ি মেরামতি জানি।

অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি—রেডিও গ্রামোফোন সাইকেল বন্দুক ক্যামেরা সিন্দুক। মেরামতি কাজে সামান্য বুদ্ধি আর খানিকটা ধৈর্য থাকলে, যে কেউ সফল হতে পারে।

দোকানির বেশী সময় দেবার অবসর কোথায় ? আপন জিনিসে

আমার মত দরদ, অপরের কাছে প্রত্যাশা করা মূঢ়তা। মেরামত হতে গিয়ে সৌখিন জিনিস ঘায়েল হয়ে ফিরে আসে, অর্থদণ্ড আর হয়রানি তো ফাউ।

থাকবে বাংলায়, হাটে যাবে না, এ হতেই পারে না, হাটে যাই চল। প্রকাণ্ড হাট। দেশ বিদেশের পালতোলা বড় বড় নৌকো এসেছে পণ্যসম্ভার নিয়ে। মালদা থেকে আম, নদের কাঁটাল, বরিশালের নারকোল, ভোলার সুপুরি। আর এসেছে নিকিরির ছিপে জালাভরা নোনা ইলিশ, বেপারির বজরায় কোলাভরা ঝোলা গুড়। তাঁতিরা সাজিয়েছে কাপড়ের দোকান, জামদানি শাড়ি, টাঙ্গাইলের শাড়ি, শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার ধুতি চাদর, মুর্শিদাবাদের ছিট, রকমারির অন্ত নেই। খাগড়াই কাঁসার বাসন সাজানো রয়েছে থরে থরে, উজিরপুরের কাটারি আছে, আছে কাস্তে কুড়োল ও চাষের সরঞ্জাম। দাকাটার জন্য মতিহার, দাঁতের গুঁড়োর রংপুরের বিলিতি আলাপাতা আর ধান পাট কাঠ বাঁশ মন্দ আসে নি এবার। কাছে কিনেরের গাঁ-গঞ্জ থেকে এসেছে মাছ তরকারি, দই ক্ষীর গোল্লা মোণ্ডা নুন তেল মসলাপাতি ছাগল ভেঁড়া মুরগি আণ্ডা, পটুয়ার পুতুল, কুমোরের হাঁড়িকুড়ি। মনোহারি দোকানেরই বা কি বাহার! কেনাবেচা পুরোদমে চলছে, বাজার সরগরম।

হঠাৎ হট্টগোল উঠলো। হিঁদুদোকানির সঙ্গে মোছলমান হাটুরের ঝগড়া হাতাহাতিতে পোঁচেছে। বেসাতিরা পসরা গুটিয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করে, লোকেরা ধামা পুটুলিতে সওদা নিয়ে পালাতে লাগলো।

বিশে-ভাই সাথীকে বললে—ভাই ধামাটা ধরতো, দুটো কিল দিয়ে আসি।

হাটে ঢুকে বিশে একজনকে কিলোচ্ছে, বিশের পিঠে আর কেউ লাগাচ্ছে কিল। কার সঙ্গে কার ঝগড়া, সে হদিস কে করে। হিঁদু

পেলেই মোছলমান কিল দিচ্ছে। মোছলমানকে হিঁদু দিচ্ছে মার বারোয়ারি কিলোকিলির ধাক্কায় হাট ভেঙ্গে গেল।

এদিকে গুরুদেব শিষ্যবাড়ি এলেন। খাস মিতরার ঠাকুর, পরম তান্ত্রিক, কারণ ছাড়া কথা কন না। কথাই আছে—মথুরা নস্যদায়িকা, মিতরাবোতলবাহিনী।

পঞ্চ 'ম'কারের অঙ্গ, এক পুরুষ্টু পাঁঠা এসে ভেঙিয়ে গুরুর সাধনে বিঘ্ন ঘটায়। শিষ্যদের আজ্ঞা করেন তিনি এর বিহিত কর।

এক শিষ্য ধরে ঠ্যাং, অপরটি খাঁড়া হাতে টলতে টলতে এসে, ঘাড়ে পিঠে নির্বিচারে হাঁক্ড়াচ্ছে। বীভৎস স্বরে অজ মাকে স্মরে—কেন জন্ম দিলি মোরে, গুরুর ধৈর্যচ্যুতি দেখা দিল, ভবানীকে লাগান ধমক—বড় গোল হয়।

ছাব্বিশ কোপের পর ভবানীর মোক্ষম প্রহারে পাঁঠার পেট দ্বিখণ্ডিত হতে গুরু মহা খুশি। আশীর্বাদ করেন—ধন্য বৎস ভবানী, ধন্য তোর গভ্ভধারিণী, ভ্যাভ্যানিনি ঠাণ্ডা করছস্। বড় সাপের যে বিষ, ছোট সাপেরও সেই বিষ। মথুরার ঠাকুর আমি, একবার গুরুগিরির ঝকমারিতে পড়ে গেলাম। মামাবাড়ির পথে স্টিমারে কেদার ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা, শিষ্যবাড়ি চলেছেন। তার পাশের গাঁয় জমিদার আমাদের শিষ্য। তাঁর মাতাঠাকুরাণী কি সব ব্রত প্রতিষ্ঠা করে, গুরুর ভাগ আগলে বসে আছেন। গুরুবংশীয় কাউকে পেলে, গছিয়ে দায় মুক্ত হন। আমাকে পেলে পূজো করে, দানসামগ্রী সমর্পণ করা চলে। কাজেই এ যাত্রায় নিস্তার নেই, এ সুযোগ ঠাকুরদা ত্যাগ করবেন না।

প্রস্তাব উত্তম, আমি কিন্তু প্রমাদ গণি। মন বলে—বাঙালী হয়েছ বাপু, পলায়ন শেখ নি। পরের স্টেশনে স্টিমার ধরতেই সেই যে গা ঢাকা দিলাম, স্টিমার না ছাড়া পর্যন্ত ঠাকুরদা আমার পাত্তা পেলেন না।

একবার আশ্বিন মাসে, ঠিক পূজোর আগে, প্রবল ঝড় এলো। যেমনই ঝড়, তেমনই বৃষ্টি। কত বাড়ি গেল উড়ে, কত নৌকো ডুবল বর্ষার দুর্ভোগের পর, এ তাণ্ডব বাংলাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। অগণিত প্রবাসী ছুটিতে বাড়ি আসবে, স্টিমার ডুবে মোল। এমন হরিষে বিষাদ জীবনে দেখি নি। তিন দিন তিন রাত্রি একাদিক্রমে প্রবল বাত্যা আর মুষলধার বর্ষণে, কতজন প্রাণ হারায়, কত পশু পাখি মরে, কত গাছ গেছে পড়ে, গণনা তার হয় না। প্রকৃতির এ ধ্বংসলীলা অভাবনীয়, মানুষের সহনশীলতার অগ্নিপরীক্ষা। দিদিমা আমাকে শেষ রাত্রে উঠিয়ে পশ্চিম আকাশে লেজওয়ালা তারা দেখান, হ্যালির ধুমকেতু, অমঙ্গলের নিদর্শন। বিলেতে সপ্তম এডওয়ার্ড মরে হয় পঞ্চমজর্জের রাজ্যাভিষেক, দিল্লীর দরবার। বাংলার দুটুকরো জোড়া লাগল বটে, কূট চালে বাংলার গৌরব রসাতলে যাবার পথ পরিষ্কার করে, রাজধানী কলকাতা ছেড়ে দিল্লীতে বসলো।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ইংরেজ, বাঙালীকে স্বরূপে চেনে, সেই থেকে সন্দেহ করে। সে যে বঙ্গমনীষার স্বর্ণযুগ। দিগ্বিজয়ী বিবেকানন্দ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ, বাগ্মী বিপিন, নেতা সুরেন্দ্রনাথ, বীর খুদিরাম, সব দিক্‌পালদের অবদানে বাংলা ধনী। ভারত বাংলার বাণী শুনতে উন্মুখ উদগ্রীব, ইংরেজের বিরাগ হবারই কথা। রাজ্যাভিষেকের হুজুগে, সরকারী পয়সায় বাজি পুড়িয়ে, মিষ্টি খাইয়ে, সিনেমা দেখিয়ে আর নাচ গানের জলসায় আমাদের আনন্দিত করে ছেড়ে দিল। বাংলার সর্বনাশ চাপা দেবার অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নি।

আগুন ছাইয়ে চাপা পড়ে না। প্রকাশের পথ না পেয়ে, অসন্তোষ অন্তর্মুখী হতে শুরু হোল সন্ত্রাসবাদ। ইংরেজ তাড়িয়ে ছাড়বে, বাঙালীর পণ।

জীবনে সেই প্রথম সিনেমা দেখি, নির্বাক চিত্র। এক চোর একপাল ছাগল পুষেছে। ছাগলরা একান্ত অনুগত, চোর যেখানে যায়, সঙ্গে যায়। সেই হোল কাল।

চোর চুরি করেছে, পুলিশ লেগেছে। দেওয়াল টপকে চোর আঙ্গিনায় ঢুকতে ছাগলগুলো ঘুরে এসে দরজায় হাজির। সেখানে থাকা বিপদজনক, পালিয়ে গেল গলির অন্ধকারে। অনুগতের পাল গলিপথে ঢুকতে লাগল। কোথায়ও গিয়ে সুখ নেই। অনুগতের বিড়ম্বনা সাধুকেও পোহাতে হয়।

বছর দুই পরে মহাযুদ্ধ শুরু হতে, কাগজওয়ালারা চাঙ্গা হয়ে উঠে গরম গরম গুল ছড়ায়। জার্মান বাংলার দোরগড়ায় এসেছে এস্‌ডেন ডুবো জাহাজে চড়ে, কলকাতায় দেখা দেবার দিন সমাগত।

রাসবিহারী হাইকোর্টে একটু দেরিতে এসেছেন। প্রধান বিচারপতির এজলাসে কেস, তিনি ঠাট্টা করে বললেন—আজ এত দেরি যে, জার্মান আসবে ভয়ে নাকি ?

—জার্মান আসবে, তার আবার ভয় কি ?

—ভয় নেই, সত্যি জার্মান এদেশে এলে কি করেন ?

—আজ্ঞে, আগু বেড়ে সম্বর্ধনা করে নিয়ে আসি।

—বলেন কি ! আপনি স্যার, রাজভক্ত প্রজা, শত্রুকে অভ্যর্থনা করবেন ?

—প্রবলকে আনুগত্য দেখিয়ে অভ্যর্থনা করা ছাড়া আর আমাদের কী শিখিয়েছেন আপনারা ?

মুখের মত জবাবে ইংরেজের লাল মুখ রাঙ্গিয়ে দিল।

মুসলমান আমলে নদীপথ পরিষ্কার রাখার বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল। ইংরেজ এসে পোল বানায়, বাণিজ্যের সুবিধা হবে। ফলে, নদী

হেজে মজে এসেছে কচুরিপানা, মাছের অভাবে ম্যালেরিয়া। বর্ষায় অগভীর জলপথে কূলপ্লাবী বন্যা, পানীয় জলের অভাবে মহামারী। আষাঢ়ের বান ডাকে। অকাল প্লাবনে আউস ধান কচি পাট ডুবে নষ্ট হচ্ছে, চাষী ফাঁপরে পড়ল। ঘবে দোরে জল, মানুষ মাচায় থাকে, গরু জলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোলায় ধান গেল পচে, বিচুলির পালা নদীতে ভাসে। এর পর অবিরাম বৃষ্টি, সোনায় সোহাগা। যাতায়াত হাট বাজার চলে নৌকোয় নৌকোয়। সাপ ব্যাং গাছে আশ্রয় নিয়েছে, মানুষের সাথে তাদেরও দিন অনাহারে কাটে। দুর্ভোগের অন্ত নেই, অনেক বাড়ি পড়ল ধ্বসে।

বানের জলে টান ধরতে, নদীর জল পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়। মাছ মরে ভেসে যাচ্ছে, দেখা দিল ম্যালেরিয়া, চারদিকে কলেরা। নদী বয়ে মড়া ভেসে চলে। কে পোড়ায় কাকে, কোথায় পোড়ায়, ডাঙ্গা জলেব তলায়। এ সব বাঙালীর গা সওয়া হয়ে এসেছে, যুগে যুগে।

বেনে বৌয়ে পুষ্কবা লাগল। মড়কে গাঁ উজাড়, হেজে মরে প্রায় সব শেষ। চিঠি লিখে জবাব পায় না, বৌ নিতে বহুদিন পব দূরদেশ থেকে জামাই এল শ্বশুববাড়ি। পথে নানা গোলযোগে, পৌঁছুতে বেশ রাত হয়েছে। বৈঠকখানায় বসাব খানিক পরে ভেতর থেকে খাবার ডাক আসে।

জামাই খেতে বসেছে, শাশুড়ী পরিবেশন কবেন। ভোজ্যের ক্রুটী নেই, নেবু দরকার। শাশুড়ী জানালা গলিয়ে লম্বা হাত মেলে, গাছ থেকে নেবু তুলে আনতে জামাই ভিরমি খেলো। বেনে বৌ আজও আছে। আমার দিদিমার খনি হতে তার কথা সামনে তুলে ধরি, ইচ্ছে হয় বাতিল করে দিতে পার।

কিন্তু, থমথমে আঁধারের যোগসাজসে অশরীরীরা আনাচে কানাচে কানাকানি করে ফেরে। এই বিচিত্র পরিবেশে, এ কাহিনী যে

অনুভূতি জাগালো, তাতে করে একটি কিশোর দিদিমার কোলঘেঁসে সেই যে চোখ বুজেছে প্রভাতের আলোর আগে তা আর মেলে নি, তার কি সবই অলীক ?

বাবুরা বিদেশে, মালক্ষ্মীদের আগলে রয়েছে পরাণ সর্দার, মাভৈ মন্ত্রের মূর্তপ্রতীক। সে থাকতে কোন আপদ তাঁদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না, এমনই খাঁটি রক্ষকরা। লাঠি চালাতে সড়কি ছুঁড়তে কৃতিত্ব প্রশংসনীয় তার। বহু চেলা নানা প্রতিযোগিতায় নাম কিনেছে, তারা লাঠি ধরতে প্রথমেই ওস্তাদের জয় গায়। এদেরই লাঠির ঘায় নাস্তানাবুদ হয়ে মিরজুমলা বাংলা ছেড়ে পালায়। বাংলার বারভুঁইয়ারা এদের পেশীর জোরেই ছিল অজেয়, তেল চুকচুকে বাবরি ফুলিয়ে, পাকা বাঁশের পাঁচহাতী লাঠি কাঁধে সর্দার চলে পাল্কীর আগে বাবুর সঙ্গে মহালে। চর দখল নিয়ে, বিদ্রোহী প্রজাদের সায়েস্তা করে জমিদারের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছে সে। এ সব কাজিয়ায়, তার সড়কি চলে অব্যর্থ লক্ষ্যে, লাঠি ঘোরে সুদর্শনচক্রের চালে। লম্বা বাঁশ ঠেকা দিয়ে সে নালা খাল পার হয় নিমেষে, রণপায় চড়ে ঘোড়ার আগে ছুটে যায়। বাংলার সে পৌরুষ আজও মরে নাই, সুদিনে চাঙ্গা হয়ে উঠে আবার দিগ্বিজয়ী হবে, সেই আশায় আছি। সকাল হতে—তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুণা, অমানীনাং মানদেন কীর্তনীয়ং সদা হরিঃ, জয় রাধে গোবিন্দ, ভিক্ষে দাও গো ব্রজবাসী। গুপীযন্ত্র বাজিয়ে কৃষ্ণলীলা গান ধরে বোস্টম বোস্টমী।

অগতির গতি মহাপ্রভু চৈতন্যের সৃষ্ট এই বৈষ্ণব সমাজ, বাঙালীকে মোছলমান কৃস্তান প্রচারকের প্রলোভন হতে রক্ষা করেছে। কত অধম, যার কোথায়ও স্থান নেই, এর আশ্রয়ে এসে তরে গেল। প্রেমতলীর মেলায় পাঁচসিকে পয়সার ভেক নিয়ে, মুখ ঢাকা বোস্টমীর হাত ধরে এনে, সহচরী করে, নেচে গেয়ে জীবন কাটিয়ে দাও, কোন

বাধা নেই। তবু, এ সম্প্রদায়ের কল্যাণে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে, অতুলনীয় তা। এদের প্রাণস্পর্শী গানে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত।

মামা পড়েন রাজসাহী কলেজে। আমাকে নিয়ে রাজসাহী এসেছেন, বাড়ি যাবার পথে।

রাজসাহী বরেন্দ্রভূমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বাস। বারেন্দ্র ব্রজেন মৈত্র রাজসাহীর উকিল, বিরাট পসার। বাড়িতে দেড়শো ছেলে থাকে খায়, কেউ পড়ে স্কুলে, কেউ কলেজে।

ছেলেরা বড় হয়েছে, বাপের এ অপব্যয় বড়ই বাধে। যত্র আয় তত্র ব্যয়, আখেরে না খেয়ে মরতে হবে। মাকে ধরল, ঠেকাও বাবাকে। বৎসলা জননী ভোলানাথ স্বামীকে অনুযোগ করেন—তুমি কি আমাদের পথে বসাবে?

গৃহে নিত্য অসন্তোষ অভিযোগ আর সহ্য হয় না। একদিন ছেলেদের ডেকে বলছেন—বাবা সব, এতদিন এখানে ছিলে, বেশ ছিলাম। এ দের ইচ্ছে নয়, আর তোমরা এ বাড়িতে থাক, সব নিজের নিজের ব্যবস্থা দেখ।

ছেলেরা চলে যেতে গিন্নি, স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ কাছারি থেকে ফেরেন অনেক রাত্রে, কোথায় খেয়ে আসেন, কে জানে। সে না হয় হোল, কিন্তু গোল বেধেছে। গিন্নি কাছারি ফেরতা স্বামীর পকেট ভর্তি টাকা পান না।

শুধোলেন—হ্যাঁগা, তোমার পকেট যে খালি, আয় কি হয়?

পতি কন—ছেলেদের পুষতে টাকার দরকার, ভগবান দিতেন। ওদের ভাগ্যেই অর্থ, ওরা নেই, ভগবান টাকা দেন না। করবে কি বল?

সন্দেহ হয়, খোঁজ করে দেখা গেল, এক বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে

মৈত্তির মশায় ছেলেদের রেখেছেন। কাছারি ফেরতা সেখানে যান, রাত্রে আহারান্তে বাড়ি ফেরেন। হার মেনে গিন্নি ছেলেদের ঘরে নিয়ে এলেন, হৃষ্টমনা পতির পকেট ভর্তি টাকা আবার আসতে লাগল। গান্ধীজী রাজসাহী এলেন কংগ্রেস প্রচার করতে, সঙ্গে দেশবন্ধু নেতাজী মহারথীবৃন্দ। রাজসাহী বলতে ব্রজেন মৈত্র, হিন্দু-মুসলমান দেবতা জ্ঞান করে তাঁকে, যদিও তিনি রাজনীতির ধারে কাছে যান না। রাজসাহীতে তাঁকে ছাড়া সভা, শিবহীন যজ্ঞের মত, ধরে এনে সভাপতি করা হোল।

বিপুল জনতা, তার মাঝে বসে বৃদ্ধ ঝিমুচ্ছেন, মঞ্চের নেতারা প্রবুদ্ধ করে কিছু বলতে বললেন।

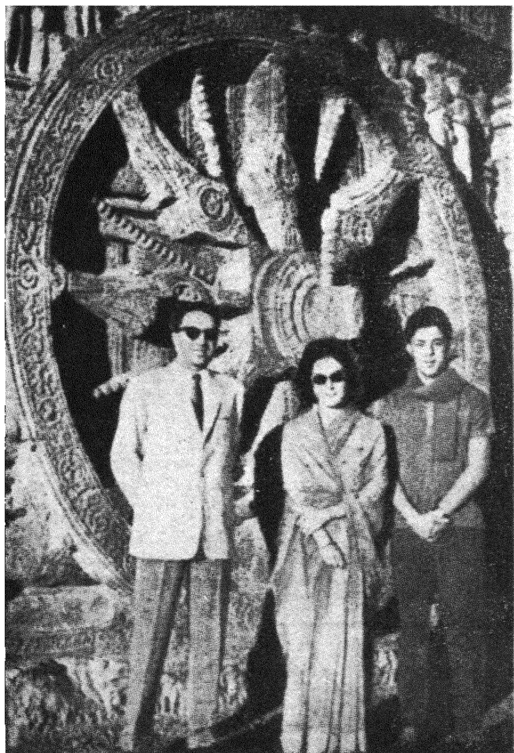
—ভাই সব, গান্ধীজী খুব ভাল লোক, তোমরা তাঁর কথা শোনো।

—আবার ঝিমুনি। কাজের লোক, কথা কম যোগায়।

চল ভাই ভাটির টানে।

নদীর ধারে নগর বাড়ি, গাঁয়ের রাজা, একটা জনপদ বিশেষ। হপ্তাখানেক ঘুরলেও গোটা গাঁয়ের সবটা দেখা হয় না, এমনই বিশাল, পাড়ার পর পাড়া। বারোশো ঘর তো বামুনই আছে, এ পাড়ায় ও পাড়ায় আদান প্রদান কুটুম্বিতে চলে।

স্টিমার ঘাট, রেজেস্টারি আপিস, ডাক্তার, স্কুল বোর্ডিং, হাসপাতাল, পাঠাগার মজুত। আছে মস্ত বাজার, বড় বড় আড়ৎ, পাটের গাঁট বাঁধা কল, কাঠ গুদোম। মহাজনী নৌকোর বহর, বড় গাঙ্গে মহাজাল ফেলতে জেলেডিঙ্গির জমজমাট। পাড়ায় পাড়ায় মন্দির শিবালয়, কালীবাড়ি শেতলাতলা আর চণ্ডীমণ্ডপে টোল চতুষ্পাঠী। বৈরাগীর আখড়া, নীলঠাকুরের পাট, বাউলের বটতলা, শ্রীঅঙ্গনে গৌর নিতাই। সবাইর সেরা বারোয়ারী জয়দুর্গাবাড়ি, মাঠের মাঝে মণ্ডপ নাটমন্দির ভোগশাল। কালীপূজোয় দুর্গাপূজোয় বিরাট সমারোহ সেখানে। নদ ব্রহ্মপুত্র, নদী যমুনা হয়ে বাংলায় ঢুকতে,



রাজা মহেন্দ্র, রাণী রত্না এবং রাজকুমার ধীরেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ দেব।

গৌতম বুদ্ধের পবিত্র জন্মস্থান লুম্বিনী

গৈরিক পেল শ্যামলশ্রী,—কিন্তু দেশের গুণে হয়ে পড়েছে বিশাল আর গভীর। একূলে দাঁড়িয়ে ওকূল ঠাহর হয় না, বড় বড় জাহাজ তার তলায় লুকোচুরি খেলে অবহেলে। পুরাকীর্তি আত্মসাৎ করে, নূতনের আবির্ভাব সম্ভব করে দেয় কালে কালে।

নগরবাড়ির দিকে নজর ফিরেছে। আমাদের পুরাতন ইমারৎ মহাপ্রস্থানের মুখে আছে করজোড়ে দাঁড়িয়ে। আমি সেবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফল আশা করে বসে আছি। বাবা পাঠালেন, বাড়িটার বিদায়বেলায় উপস্থিত থেকে জঠরে সঞ্চিত সামগ্রীর হিল্লে করে আসতে, আমাকে দেশে।

জমেছে কি কম? দোল দুর্গোৎসবের সেকেলে মাপের যোজনবিস্তৃত সব বারকোশ পরাৎ, থালা খোরা, ডেগ জালা। এই বিশমোণী বাসনগুলো তারা কি করে তুলতো নাড়তো জানি না। যেমনই ভারী তেমনই সিক্কিম, ক'পুরুষের জন্য গড়েছিল, কে জানে। চৌকাঠ কবাট খাট চৌকি রাশি রাশি। আমরা কেউ থাকি না, সিন্দুকভরা ভরা জিনিস, গিয়ে পেলাম, সে বাংলাদেশ বলেই।

নগরবাড়ির ঠাকুররা বর্ধিষ্ণু সমাজ, অর্ধেক বাংলার ব্রাহ্মণের গুরু। রাজা মথুরা রায় এক মহাপুরুষকে গুরু করে এনে বসান, তাঁর সন্তানেরা মথুরা রায়ের ঠাকুর—মথুরার ঠাকুর। পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানী এঁদের চৌষট্টি হাজার বিঘে ভূঁই ব্রহ্মোত্তর দিয়ে যান, বহু দিগ্‌গজ পণ্ডিত এ বংশে জন্মেছে, সাত্ত্বিকতায় এঁরা দেশ বিখ্যাত। মাদের তিন বোনের বিয়ে হয়েছে এই নগরবাড়ি মথুরার ঠাকুরের ঘরে—উত্তরবাড়ি, আমাদের বাড়িতে মা, দক্ষিণবাড়িতে মেজমাসী বড় বাগানে বড়মাসীমা।

সকালবেলার আপ স্টিমারে এসে উঠলাম বড় বাগানে। বাড়ি মানে, বত্রিশখানা বড় বড় টিনের ঘর, তার কয়েকটা দোতলা, চারটে উঠোন পেরিয়ে, ঢেঁকিশালে বড়মাসীমাকে দেখি, কি একটা মসলা

কোটা হচ্ছে, উস্কে আলিয়ে দিচ্ছেন। বাড়ি ঢুকতে পড়বে নহবৎ, ডাইনে বাঁয়ে ফটক ঘর। ভদ্রাশনের ছুধারে ছুই ঘর—বৈঠকখানা আর কাছারি—সামনে মণ্ডপ। মণ্ডপের পিছনে হবিষ্যিঘর, পূজোর ঘর। বাস্তুর চারপাশে চারটে দোতলা ঘর, তারপর আঁশ রান্নার বিরাট হেঁসেল ঘর, খাবার ঘর। খিড়কীর আঙ্গিনায় ঢেঁকিশাল আর কি কি। বড়মাসীমাদের কাঠের কারবার। আসামের ইজেরা বন হতে কাঠ আসে নদী বয়ে মাচা বাঁধা হয়ে। নদী ছাড়া গতি নেই, নদীর দৌরাত্ম্যে পাকাবাড়ি হয় না।

ছু'ভায়ের সংসার, ছোট যোগেনঠাকুর কর্তা। বড় ভাই মহা' মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, শাস্ত্রচর্চা নিয়ে আছেন, গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত, ছেলেমেয়ে বড় কেউ নেই, কিন্তু আত্মীয় পরিজন আমলাফয়লা নিয়ে একবেলায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন খায়। গিন্নি বড়মাসীমাকে সাহায্য করতে ছুজন উৎকলবাসী আছে, ছু'বেলা খাবার ঘণ্টা পড়ে· লোকে বলে, শরীর খারাপ হয়। কৈ আমার মাসীমার কাঁচা সোনার বর্ণ তো মলিন হতে দেখি নি।

ছু'মাস ছিলাম, মাসীমার দর্শন মিলেছে ছু'চারবার। আমার নিত্য নিমন্ত্রণ, বার ব্রত ব্রাহ্মণ ভোজন খেয়ে বেড়াচ্ছি, আমার মাসীর কি আর ফুরসৎ আছে? পাড়ায় কারও অসুখে পথ্যি রাঁধতে, মেয়ে বিদেয় হতে কারও, আঁতুড়ে সেবার তরে, কখন তিনি কোথায় হাজির আছেন, বলা ভার। সকালে চারটেয় নদীতে প্রাতঃস্নান, আমরা তখন উঠি না। হবিষ্যির জোগাড় ঠিক রেখে, ফুল তুলে ছ'টা সজ্জ করে, নিজের পূজো সারলেন। হেঁসেলে রান্নার সব জোগাড় ঠিক আছে, দেখে নিয়ে, তিনি তাঁর বৃহত্তর পরিজনের ঘরে ঘরে কোথায় কিসে আটকেছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামাল করে দিচ্ছেন। ছুপুরে নিজের' বাড়িতে খাবার সময় উপস্থিত থাকেন আবার চললেন পাড়ায় বাকি কাজ সারতে। নিজে খেতে তো বেলা চারটে, তা

সে রকম আটকা পড়লে সেটাও তোলা থাকে।
একদিন সকালে দেখি, মাসী কাঁদতে কাঁদতে চান করে এলেন। কার বাচ্চা ছেলেকে চারদিন চাররাত কোলে করে বসেছিলেন, আজ তাকে শেষ বিদেয় দিয়ে ঘরে ফিরেছেন।

জমিদার শশিভূষণ গ্রামোফোন কিনেছেন। সন্ধ্যেবেলা রেকর্ড বাজান, তাজ্জব মেনে শুনি। মনে হয়, কে যেন বাক্সের ভিতর বসে আছে, মানুষের এতটা কেরামতি কি মাথায় ঢুকতো তখন? নদীর ধারে বাড়ি। ঘাটের দু'পাশে সুন্দর বেড়া দেওয়া ফুলের বাগান, আমি আর গেঁদি নিত্য ভোরে দিদিমার পুজোর ফুল তুলি। নাটমন্দিরটি বড় সুন্দর, দেয়ালে বড় বড় রঙ্গিন চিত্র, কত পৌরাণিক ছবি কত কথা কয়। চিত্রকর আপনি গুণবান লোক, ছোট বড় সকলের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার তাঁর। আমাকে আদর করে ফুল দিতেন, শিশু হৃদয়ে সে ছাপ অক্ষয় হয়ে আছে।
প্রতিমার সম্মুখে নাটমন্দিরে যাত্রা হয়। শশী অধিকারী হাঁটুতে ছড়ি চেপে, বেহালায় মাছ কাটার তালে কেটে কেটে সুর বাজালো, বলিহারি বাহাদুরী!
অপেরা নিয়ে ফেরে কর্মবীর মুকুন্দ দাস, মাকালীর ভক্ত সাধক, চারণ কবি। উন্নত গড়ন, জাঁদরেল চেহারা, মণি খচিত উষ্ণীষ, বুকভরা সোনার মেডেল। কে বলবে, বরিশেলে নরসুন্দর এ, বাপ চোদ্দ পুরুষ মাথা কামিয়ে বেড়াত।
উদাত্ত স্বরে গেয়ে উঠেছে—'পরো না কাঁচের চুড়ি,' বঙ্গনারী আর পরো না, ভাঙ্গা চুড়ির পাহাড় বনে গেল। মন ছুঁতে জানলে সব পাব, বুদ্ধির গোলক ধাঁধাঁয় মন হারিয়ে বসি। দরদী সুরের পরশ হৃদয়ে চেতনা আনে। লক্ষ কেতাব লিখে, সহস্র বাগ্‌বীর গলা ফাটিয়ে যা করতে পারে না, এ যাদুকর মোহিনী বিদ্যায় তা হাসিল

করেছে। গৌড়জন জেগে উঠে নিজের দিকে চোখ ফেরালো, মাকে চিনলো। সার্থক কর্ম তার, সফল সাধনা। ঢাকার বেনে লালমোহন মায়ের শ্রাদ্ধ করবে। দেশশুদ্ধু বামুন পণ্ডিতের কাছে পাঁতি গেছে—তাঁরা যেন পদরজঃ ফেলে ফেলে শ্রাদ্ধবাসর পবিত্র করেন। দিগ্দেশ হতে ধুরন্ধর সব বিদ্বান জুটলো এসে। তিলকাঞ্চন দানসাগর চন্দনধেনু বৃষোৎসর্গ বিধানমত সম্পন্ন হবে। ত্রুটি হবার কি জো রেখেছে।

বসল শাস্ত্রজ্ঞদের বিতর্ক সভা, কান পাতা দায়। টিকি নড়ে সঘনে, কাছা মুচ্ড়ে হয়েছে দড়ি, শ্রাদ্ধ কদ্দুর গড়ায়, কে জানে। এই সভা পাণ্ডিত্যের দৌড় দেখে, কেরামতির বহর মেপে, খেতাব দেবে—মহা মহোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন ন্যায়ালঙ্কার তর্কচঞ্চু। ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে সস্তায় অলঙ্কৃত হবার উপায় তো জানা ছিল না।

কচ্কচি মিটাতে, সমাগত বিবুধদের তসরের জোড়ের সঙ্গে এক একটি সোনার শাঁখা হাতে দিয়ে বিদেয় করা হচ্ছে। তাঁরা কিন্তু লালমোহনকে—বাবু লালমোহন সা শঙ্খনিধি করে ছাড়েন।

ঢাউস ঘুড়ি, ঢাউস ঘুড়ি দেখেছো ?

সেই যে নিচের দিকে একটু চেপে, প্রায় চারকোণা চালার মত গড়ন আর মাথায় তার বেতের ছিলে দেওয়া এক ধনুক। সে কি তার গর্জন! বাতাস যত বয়, আওয়াজ পর্দায় পর্দায় চড়ে। দূর দূরান্তর হতে সব শুনতে পায়, ঘুড়ি উড়ছে। সূতোর সাধ্য কি আটকায় তাকে। সরু শোনের দড়ি ধরে ওড়ে সে। বাতাস জোর পেলে, মানুষ টেনে নেয়। তোড় জোরই কি কম ? যে সে ওড়াবে, তা আর হয় না। ফসলের চারা পাট করতে যে গান গায়, তার পোঁ ধরে ঢাউস। নিঝুম দুপুরে সে নিরালা মাঠে সারবন্দি নিড়েনের তালে তোলা উদাসী মিঠে সুর, মাথার উপ[illegible]জানির ওঠা নামায়

মিশে মনকে দিগন্তে উড়িয়ে নিয়ে যায়। হাউসের কি অন্ত আছে? মানুষ বানিয়ে ওড়ালো, চিলঘুড়ি উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে, ওই দেখ ওটা বাক্সঘুড়ি। সাপ তো দেখাই যাচ্ছে, ফণা তুলে লেজে ঢেউ খেলিয়ে উড়ছে। আর পতেঙ্গারা চ্যাংরা, ঘুঁড়ির সমাজে ছোটলোক। আভিজাত্য নেই, চটকে ভুলাবে, তাই রং চং বেশী, ফর ফর করে বেড়ায়।

নিদাঘে বাংলার মাঠে ঘুড়ির মেলা দেখে এস। নিচে দোলে সবুজের সমুদ্র, মাথার ওপর অনন্ত নীলে রং বেরংয়ের ঘুড়ির খেলায় চোখ জুড়োবে, ভাওয়াইয়া মন ভোলাবে। এমনটি কোথায়ও মেলে না।

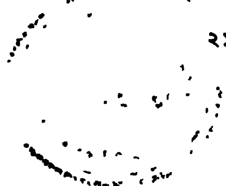
আড়ংয়ের মেলায় যাচ্ছো, চল।

এ যে কাত্তিকটি সেজেছো। সিমলেই ধুতি, শান্তিপুরে উড়ুনি। আহা বেশ কল্‌কেটি তো! বাঃ, বাহারে চুল ছাঁটাই! ঢাকাই ছাঁট। হরে নাপ্‌তে দেখি এতও সব জানে! নাগরাটা বুঝি গঞ্জের হাটে কিনলে?

মা দুগগা পান্তা খেয়ে, জনে জনের চোখের জলে বিদেয় চেয়ে, চলেছেন শ্বশুরবাড়ি। বিসজ্জনের বাদ্যি থেমেছে। এবার সাঁঝের ঝোঁকে পিত্তিমে ঘাড়ে করে, নদীর ঘাটে নৌকোয় বসাল। ঢাকীরা ঢাক পেটে মনের সুখে, ক্যান্ ক্যান্ কাঁড়ার বোল, আলোয় আলোময়। সাজানো পান্‌সি, উৎফুল্ল যাত্রী, তার মাঝে পিত্তিমে, রূপের পসরা বয়ে নৌকো আড়ংএ যাচ্ছে।

পিত্তিমে কি একটা দু'টো, নৌকো কি এক আধখানা, এদিক উদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পান্‌সি পিত্তিমে নিয়ে সেজে এল। নদীর মুখে আলোর খেলা, তরীর বুকে রূপের মেলা যে দেখেছে সেই মজেছে। জলের 'পর ঢাকের বাদ্যি, নদী বয়ে নাদের লহর তোলে গম্ভীরে।

ভরা নদী, সোনালী মাঠ, সবুজ গাছে হেসে উঠল থলকমল। নীল



জলে কুমুদকহ্লার উপচে পড়ে উল্লাসে। নির্মল আকাশে তারার মেলা সুদূরের ইসারায় মহীয়ান্। ঝক্মকে রোদ, কান্তিময় দিগ্দেশ গেয়ে ওঠে আগমনী গান, চিৎ ভোলায় প্রাণ কাড়ে। মন যায় আত্মপর সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতে, এই তো বাংলার শারদীয়া।

নাকাড়ায় কাঠি পড়ে, এবার বাচ্।

মাস্তুলের ডগায় নিশেন উঁচিয়ে, নেচে গেয়ে তাল দিচ্ছে মূল গায়েন। ঘুমুর সিঞ্জনের লয়ে ষাট বৈঠে উঠে পড়ে, নক্ষত্র বেগে ছুটেছে তরণী। হালি হাল চেপে, সোজা চালায় তাকে। এ যে অগুন্তি, কার আগে কে যায় বলা দায়। ঐ যে একটা তড়বড় করে টপকে ছুটে গেল। সে কী উত্তেজনা, সে কী সোরগোল, সব বাহবা দিচ্ছে গলা ফাটিয়ে। আড়ং হাততালির হররায় গম্গম্ করে উঠলো। যাঃ, কোত্থেকে আগুবেড়ে আসে এ ছিপ, সব পড়েছে পিছনে। মারো যোয়ান, হেঁইয়ো হেঁইয়ো, বাস্ বাজি মাৎ। জনতা সাবাস ধ্বনি তুলে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। এ কি হেলা ফেলায় পাওয়া, যে সে খাতের? যৌবনের উচ্ছ্বাস, যতির বিকাশ আর কর্ণধারের কেরামতি মিলে সামঞ্জস্যের জয়যাত্রা, নহি বলহীনেন লভ্য।

পিসীর বাড়ি যাব।

বোনের বাড়ি কেস্টনগর এসেছি, মন বলে যাই কালীঘাট, পিসীমাকে দেখে আসি। বাড়ি কোঁড়কদি বাচস্পতি বংশ, তিন পুরুষ কালীঘাটে বাস, সকালের লোকাল দশটায় শেয়ালদা পৌঁছে যাচ্ছে। স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে উঠে এল সব মার্কামারা কেরানীর দল। সকালে লালদীঘি সন্ধ্যেয় বাড়ি করছে এরা আজ কা'পুরুষ। আশা আছে, সায়েবের দয়া হলে ছেলেটাকেও ঢোকাবে ওই দশটা পাঁচটার জাঁতি কলে। বড়বাবুর সুমুন্দিটা বাগড়া দেয়, সেই যা বাধা।

ডজনখানেক তাবিজ কবচ ঝোলে হাতে গলায়, কোনটা ধুয়ে জল

খায়, কোনটা ঠেকায় মাথায়। বড় সায়েব হেসে কথা কয়েছে কি গ্যাছে, লাল হয়ে উঠে ফিউচাব প্রস্পেক্টেব আশায়। মোটা লেজাব লিখতে পাবে, ছোট সায়েবের মর্জি হলে, একটা সেক্সনের চার্জ পাওয়া ঘটে যেতে পারে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

সার্কাসেব মোট বয় গাধা। মালিক এ গাঁয়, সে বাজারে খেলা দেখায়, ছুটি পেয়ে গাধা চরতে যায়। খেল খতম, পৈসা হজম, আবার মোটঘাট ঘাড়ে চাপে। গাধা চলেছে ভিন্‌গাঁয়, নূতন আস্তানায় খেতে না পেয়ে গায় মাংস ধরে না, রোগাটে।

বাজারের ধারে নদী, ধোপা কাপড় কাচে। বাজারে খেলা চলেছে, গাধা নদীর ধারে চরতে যেতে ধোপার গাধা স্বাগত সম্ভাষণ জানাল।

—ভাই, বড় কাহিল দেখি যে, দানাপানি ঠিক মত জোটে তো ?

—সে আর বল কেন ভাই, খাবার ফুরসৎ কৈ ? খেল শেষ হলেই ধরে নিয়ে মোট চাপাবে, চলো অন্য আখাড়ায়। খাব জিরোবো, সে আর হয় না।

—চলে এস আমার মনিবের কাছে, তোফা মৌজ। সকালে কাপড় বয়ে এনে ফেলে দিয়েছি, দিন-ভোর কাচাকুচি চলবে, সন্ধ্যেয় আবার মোট বয়ে ঘরে ফিরি। সারাবেলা আরামসে' খাও গড়াও, কেউ কিচ্ছু বলবাব নেই। বলি কি, ঝকমারি ফেলে সোজা চলে এস ভাই, ছুটিতে বেশ থাকব এখন।

—কথা মন্দ বল নাই, মাঝে মাঝে আমারও মনে হয়, তুত্তোর সব ফেলে কেটে পড়ি। কিন্তু ভাই, ফিউচার প্রস্পেক্ট আছে একটা, সেই টানেই পড়ে আছি, আর কি। বলি তবে, শোনো, ঐ যে খলিফা, ওর বেটিটা খাপসুরৎ পরীর বাচ্চা, দড়ির উপর নাচে। নাচ শুরু হতেই বাপ হুসিয়ারি ছাড়ে—হোস্ করো, গিরোগী তো গধেসে সাদী করা দুঙ্গা। জানো তো ভাই, তাকের খেলা, একদিন পা ফস্‌কাবেই।

ড্যাবড্যাবে চোখ, নাকে কানে তেল দিয়ে চান করেছে, বিরল কেশে সিঁথের রেখা আঁচড়ানো। গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে, যত্নে ভাঁজ করা গাঁট বাঁধা মোটা কাগজ নিয়ে খুলে বেঞ্চে পাতা হোল। বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতির কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে বসল জাঁকিয়ে। এবার পকেট থেকে বেরুবে চৌকো টিনের কৌটায় আধপোড়া বিড়ি। দেশলাই চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে প্রসঙ্গ চলে, হয় বড় সায়েব ছোট সায়েব বড়বাবু ছোটবাবু নয়তো গাঁয়ের কোঁদল গিন্নির ভিয়েনে পাক করা। সগোত্রীয়দের সঙ্গে দল পাকায়, কাকে একঘরে করবে, কার মেয়ের বিয়ে ভাঙ্গাবে, গাড়িতে বসে বসেই। দেশঘরের সঙ্গে রাত্রে যোগাযোগ, এসব গুরুতর আলাপ আলোচনার ফুরসৎ কোথায় ?

সন্ধ্যেয় কালীঘাটের বাড়িতে কলরব ওঠে, যেন ঝুরিবটে কাকের বাসা। খেটে খায় ছোটলোক, এরা ভদ্রসন্তান। কেউ এসেছে ঢাকা থেকে, কারো বাড়ি পাবনা, পিসীমার ঘরে খায়। কেউ করে সিনেমার দালালি কেউ ভাজে ভেরেণ্ডা, আছে এরা গুটি ত্রিশ বত্রিশ। আপিস ফেরতা সব রেসের ঘোড়া নিয়ে পড়েছে—কার টিপ লাগে, কারটা বা লাগে না, তারই সরব গবেষণা।

বাড়ির কর্তা যিনি, আমার দাদা, তাঁর দেখা বাইরে কচিৎ মেলে। কলকাতার বাজারে এই পল্লীর অন্ন যোগাচ্ছেন তিনি, তবে কিনা এটা বংশগত। সকলের সঙ্গে একপাশে বসে খেয়ে, তাকিয়া বুকে কোণের ঘরে পড়ে আছেন, এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে। হৈ হল্লা চরমে উঠলে, অর্থাৎ কিনা টেবিল চৌকি চাপড়ানোর বাড়াবাড়ি হতে, কখন সখন বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছেন—থামা তোদের গণ্ডগোল। আবার সব চুপচাপ, গলাবাজি ফিসফিসিনিতে নেমে এসেছে, দাদাও অন্তর্ধান। কথা বড় কম কন। লম্বা কাগজ মেলে হিসেব কষছেন, রেসের বুকমেকার, এই তাঁর পেশা। বাংলার পচপচে ঘাম, উঠোনে

চৌকিতে বসে হাওয়া খাচ্ছি, দাদা এসে পাশে বসলেন। ওঘরে রেসওয়ালাদের খচমচি জমজমাট। কোথায় কে দিব্বি দিয়ে রেখেছে—এটা আমি জানি না বলা মহাপাপ।

দাদা বলেন—দেখ ভায়া, মাইনে এরা কম পায়, কেউ এদের থাকা খাওয়ার ভার না নিলে, এরা পারবে কেন?

বলি—দাদা কি বলতে চান, এদের ভাল করছেন? অজ্ঞান সব, তা না হলে, দাদার মাথা আগে ভাঙ্গতো। পরকাল ঝরঝরে করে ছেড়েছেন আপনি।

দাদা নীরব। আমি বলি, এদের দেশেঘরে জমিজিরেৎ বাগান পুকুর আছে, তা চালিয়ে দিব্বি খেতে পরতে পায়। ঐ বুদ্ধি বিদ্যেয় কলকাতা বাস চলে কি? দাদার আস্কারা পেয়ে দেশঘর ছেড়ে, সহরের চটকে হতভম্ব, পড়ে আছে। আচ্ছা ধরুন, একদিন দাদা আর এদের পুষতে পারেন না। কি হবে, কোথায় দাঁড়াবে এরা, 'নামকরা না ঘাটকা'?

—খিদের জ্বালায় বাঘ ধান খায়।

হেঁসেলের দাওয়ায় রাত্রে খাচ্ছি, আমার দিকে পিছন ফিরে খাচ্ছে একজন। বৌদিদি পরম যত্নে আদর করে খাওয়াচ্ছেন তাকে। খাওয়া হলে, দোরগড়ায় পৌঁছে বললেন—বাবা, ঘর তো চেনাই হোল, যখন ইচ্ছে এসে খেয়ে যেয়ো।

তাকিয়ে দেখি, মাথায় বাবুইর বাসা, খালি পা, আদুর গায় শতছিন্ন পিরাণবিশিষ্ট ভদ্রলোক সদর পেরুচ্ছে।

ফিরে এলে বৌদিকে শুধোই—ভাইটি থাকেন কোথায়, কি করা হয়?

—আহা বেচারী, বড় কষ্ট। মাথা খারাপ বলে আপিসে কাজ খোয়ালে। এখন কেওড়াতলা শ্মশানে আছে। আজই দেখ না, মড়া ঘাটে পাওয়া জুতোর একপাটি খুইয়ে, ধাঙ্গড়দের সাথে চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করে এসেছে।

শুনলাম, তিন দিন অভুক্ত থাকার পর শ্মশানবাসীর হুঁস হতে বন্ধুকে চিঠি লিখেছে—যদি এক মুঠো অন্ন জোটে। বন্ধুটি এঁদের আশ্রিত, তাই তার হেথায় শুভাগমন।

আমি থাকতে থাকতেই, গাঁয়ের ছেলেকে সঙ্গে করে এলেন পিসীমার বড়জা, দিব্যদর্শন পেলাম।

বিরাশিবছরের বুড়ি, কোঁড়কদির বিশাল চক মেলানো পুরী আগলে পড়ে আছেন। স্বামীর ভিটে ছেড়ে নড়বেন না, ঠাকুরদালানে সন্ধ্যে দেবে কে? হঠাৎ কি মনে হতে, ছেলেকে দেখতে এসেছেন। ছেলেটি বিলক্ষণ পণ্ডিত, তান্ত্রিক আশ্রম খুলে কালীঘাটে আছেন। দাঁত নড়ে না, চুল পাকে নি, সূঁচে সূতো গলিয়ে দিব্বি সেলাই করেন, নিত্য প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান, স্বপাকে রান্না চাপাচ্ছেন। ফরমাইস করে তাঁর রান্না ডাল ছড়ানো তরকারি খেয়ে তৃপ্ত হয়ে এসেছি। সাতদিনের মাথায় বাড়ি বসে চিঠি পাই—ওঁ গঙ্গা, পরমারাধ্যা মাতৃদেবী সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেছেন।

অসুখ নয়, বিসুখ না, ছেলের হাতে আগুন পাওয়ার রহস্যটা ভেদ করবে কে—চিন্তনীয়।

মধ্য ইংরাজী পার করে উচ্চ ইংরাজী পড়তে দ্বারভাঙ্গা এলাম। ছুটিতে বাড়ি যাওয়া চলে। জিলা স্কুলের সঙ্গী বিম, শরৎ, ঘোঁৎনা, ঘোঁতন। আমি আর বিম একবাড়ির ছেলে, পাড়ায় বিষম রেষারেষি কে কাকে বা ছাড়িয়ে যায়। বিমকে পড়ান তার বাবা প্রতাপ রায়, তাঁর মত আদর্শ পুরুষ দুর্লভ। উকিল হতে গেলেন, চললো না, মিথ্যে ছাড়া ওকালতি অচল। হলেন জজের সেরেস্তাদার। পরম পণ্ডিত, ইংরাজী অঙ্ক ব্যাকরণ ভূগোল, সব তাতে তাঁর ব্যুৎপত্তি। আপিসের খাটুনি খেটে, দুবেলা নিয়মিত পড়ান, ব্যতিক্রম নেই।

অসাধারণ অধ্যবসায়, ছেলেরা উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, কেউ আই জি, কেউ কন্‌ট্রোলার জেনারেল।

ঘোঁৎনা এল ছুটির দিনের সকালটায় বিমের বাড়িতে আড্ডা দিতে। 'বিম' 'বিম' করে বাইরের ঘরে এসে ডাকছে।

বেরিয়ে এসেছেন নাতুস্‌নুতুস্‌ প্রতাপ রায়—কাকে চাই ?

—আজ্ঞে, বিমকে ডাকছি।

—তুমি বিমের সঙ্গে পড় বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভেতর থেকে নিয়ে এলেন পানিনি ব্যাকরণ—তিঙ্যন্তপ্রকরণ জান ?

ঘোঁতন নীরব।

—এই নাও, ততক্ষণে পড়ে ফেল, বিম একটু পরে আসবে, পড়ছে।

তিনি ঘরে ঢুকতেই, বই ফেলে ঘোঁৎনা দে চম্পট, ফাঁড়া কাটলো, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোয় যেমন দৃষ্টি, গান বাজনা খেলাধুলায়ও প্রচুর উৎসাহ দিতেন। ছেলেমেয়েরা বেহালা বাজাতে টেনিস খেলতে ওস্তাদ। নিজে বাজার করে এনে ছেলেদের খাওয়ান ভাল মাছ দুধ ঘী, না খেলে মাথা খুলবে কেন ?

ঘর দোর সাজানো গোছানো এক বাতিক। ঝাঁটা হাতে সকালে এ ঘর সে ঘর করে, চাকরেরা যা করেছে তার 'পর এক হাত চলে।

মজঃফরপুর হতে শালার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসেন ভদ্রলোকেরা। দুপুরবেলা, সব স্কুলে কাছারিতে, বাড়িতে আছে ছোট ছেলে ফকু।

—খোকা, তোমার বাবা কোথায় ?

—কাছারিতে।

কি করেন ?

ঘর ঝাঁট দেন আর পাখা টানেন।

দ্বারভাঙ্গায় তখন বিজলী নেই, প্রতাপ রায় বাড়িতে টানা পাখা টেনে হাওয়া খেতেন আর পড়াতেন।

বাংলার পিলে পেটে নিয়ে দ্বারভাঙ্গায় পড়তে এল নরেন, সুধীরবাবুর বাড়িতে থাকে। ভোর চারটেয় সুধীরবাবুর মা নরেনকে তুলে খাওয়ান বক্‌না বাছুরের টাটকা চোনা এক গ্লাস, ভিজে ছোলা আদা চিবুতে দিতেন। সেই ভোরে মাপা এক মাইল দৌড়ানোও ছিল নিত্য রুটিন, নরেনের পিলে সেরে গেল। পুকুরে নামতে ভাঙ্গা কাঁচ বিঁধলো গোড়ালিতে, বড় ঘা, প্রচুর রক্ত পড়ছে। আতার পাতা পিষে লাগিয়ে বেঁধে দিতে রক্ত বন্ধ হয়, ক'দিনেই ঘা ভাল হয়ে গেল। তাঁর কত টোটকা জানা ছিল, সংখ্যা হয় না।

বাপের আমলের বুড়ো পণ্ডিত আছেন বাড়িতে, এককালে তিনি দ্বারভাঙ্গা রাজার দ্বার পণ্ডিত ছিলেন।

বলতাম—পণ্ডিতজী, আপনি কি পণ্ডিত বটে ?

—মুখ্য পণ্ডিত।

—মূর্খ পণ্ডিত ?

—ওরে না না, মুখ্য পণ্ডিত।

তবু বলি মূর্খ পণ্ডিত, আর চটে যান।

আর এক ছিলেন নানীসাহেবা। রাজাকে একমুখী রুদ্রাক্ষ বেচেছেন চোদ্দশো টাকায়, রাজার কত গল্প বলেন। রামেশ্বর সিং রাজা কালীসাধক, মন্দিরে পুকুরে বহু স্থানে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। তাঁর বাড়ি নেই, এমন বড় শহর নেই ভারতে। এমন বিচক্ষণ নরপতি অল্পই জন্মেছে। সামান্য চল্লিশ লক্ষ থেকে তিনি রাজ্যের আয় ওঠালেন কোটি টাকার উপর। মজুদ টাকা প্রচুর, বহু রাজা তাঁর টাকা ধারেন। এ সব উন্নতির মূলে ছিলেন, ম্যানেজার প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পনেরো টাকার কেরানী থেকে বুদ্ধিবলে রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে তিনি রাজার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এই প্রিয়দর্শন নিরহঙ্কার দীর্ঘ পুরুষটি রাজার অতি আপনার জন। রামেশ্বর সিং মরার সময় ছেলে দুটিকে তাঁর হাতে দিয়ে, ছেলেদের বলে যান—

আমার অবর্তমানে এঁকেই পিতৃতুল্য জ্ঞান করে সঙ্কটে পরামর্শ নিও।

প্রিয়নাথ মারা গেলে রাজা কামেশ্বর, তাঁর ভাই বিশ্বেশ্বর সিং কাঁধে করে নিয়ে দাহ করেছেন।

রাজার কৃপায় দ্বারভাঙ্গার লোকেরা সস্তায় খাঁটি দুধ, তাজা তরকারি পায়, বাগানে আর গোশালায় সাহেব ম্যানেজার আছে তাঁর। বড় বড় আম বাগান রাজার। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের সার হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। বিহারের আম্রবন প্রসিদ্ধ, রাজপ্রাসাদ ফেলে বুদ্ধ সেখানে ধর্মসভা ডাকতেন। দ্বারভাঙ্গার ল্যাংড়া বিখ্যাত আম, দ্বারভাঙ্গায় রামমূর্তি আর তারাবাইকে দেখি। একজন বুকে হাতি তোলে, পুরো দমে চলা জোড়া মোটর দু'হাতে 'ধরে আটকে দেয়। মালক্ষ্মী সাতমোণি পাথর চুলে বেঁধে ঝোলান। গরুর গাড়িতে দনাদশেক লোক চেপেছে, ধারালো লোহার ডগায় মাথা লাগিয়ে তা ঠেলে এগুচ্ছেন অনায়াসে।

রামমূর্তির গায় হাত বুলিয়ে রাজা বলেন—গা তো দেখি, বেশ নরম, হাতির ভার সয় কি করে?

রামমূর্তি বলে—ফুটবলে হাওয়া থাকে, তাই চাপলেও চুপসে যায় না। কুম্ভকে বুকে হাওয়া পুরে হাতি তুলি নইলে আশিমোণ ভারের চাপে পাঁজরা ছাতু হয়ে যাবে, সন্দেহ কি?

এক বুড়ির গল্প শোনাল।

গরুর বাচ্ছা হয়েছে, বাচ্ছাকে কোলে তুলে বুড়ি রোজ মাঠে নিয়ে যায়। বাচ্ছা বড় হয়, বুড়ি কিন্তু আনায়াসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে যেতে লাগল। অল্পে অল্পে বাড়ালে এ ভার যে কেউ সইতে পারে।

ছোটবেলায় রোগাপটকা ছিল সে। একটা বেঁটে ছোকরার হাতে মার খেয়ে, ধিক্কারে শুরু হয় বলী হবার অধ্যবসায়। •আজ এ সব করতে পারছে।

দ্বারভাঙ্গার কোথায়ও আগুন লেগেছে কি পয়সার থলি হাতে ছুটে আসবেন রাখালবাবু। গরমের দিনে তাঁর থলি ভর্তি সিকি তুয়ানি আনি পয়সা থাকে। আগুনের প্রকোপ যেমন বাড়ে, এক আনা কলসী হতে তু'আনা তিন চার আনা কলসী দরে জল ঢালান অকাতরে, সহৃদয়তার তুলনা নেই। প্রাসাদতুল্য তাঁর বাড়ির নিচে অতিথিশালা, ঠাকুর চাকর আছে মোতায়েন। উপরন্তু উপর থেকে অতিথিদের জন্য নানা ব্যঞ্জন আসে, নিজে উপস্থিত থেকে অতিথি সেবা করেন।

বাবা মহেশবাবুর আমলে বর্ধমান হতে এল এক ব্রাহ্মণ। বাবু অতিথিদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

—মহাশয়ের নাম?

—আজ্ঞে, শ্রীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—প্রণাম হই, মহাশয়ের নিবাস?

—আজ্ঞে, বর্ধমান পোড়ামাত্র।

—মহাশয়ের কি করা হয়?

আজ্ঞে, লেখাপড়া বিশেষ হয় নি, কি করি। কোন কাজ পাওয়া যায় কিনা, সেই খোঁজেই আসা।

বাবু ফিটনে বেড়ান, সঙ্গে সারদাপ্রসাদ। থানমলের গদিতে ঢুকলেন, শেঠজী ছুটে এল অভ্যর্থনা করতে।

বল্লেন—এই বাবু রোজ সকালে এক টিন ঘী নিয়ে, সন্ধ্যেয় বিক্রি ঘীর দাম আর বাকি ঘী ফেরৎ দেবে। এর জিম্মা আছি আমি। ষোল টাকার এক টিন ঘী নিয়ে সারদাপ্রসাদের ব্যবসার গোড়া পত্তন, তা থেকে তিনি হন দ্বারভাঙ্গার শ্রেষ্ঠ ঘী ব্যবসায়ী, উপায় করেন প্রভূত ধনসম্পত্তি। জামাই ভূপতিভূষণকে ব্যবসায় নামিয়ে ওখানকার ধনীব্যবসায়ীর শ্রেণীতে দাঁড় করালেন।

সরকারী উকিল অদ্বৈতবাবু মহাত্মা লোক। বাড়িতে তাঁর

অতিথিশালা, প্রবাসী বহু থাকে খায়। নিজের সুখ সুবিধার খেয়াল নেই ভদ্রলোকের, সব ভাল কাজে তিনি অগ্রণী। বাল্য সঙ্গী সুরেনই বাড়ির কর্তা। কাছারিতে নোট নিয়ে বাড়ি এসে পড়তে পারেন না। ডাক পড়ে সুরেনের—দেখতো মাস্টার, কি লিখেছি এটা। পাঠোদ্ধার করে সুরেন সঙ্কট মোচন করে, এমনই আত্মভোলা লোক। দ্বারভাঙ্গায় থিয়েটার হয় 'প্রফুল্ল', দাদা শশীবাবু 'যোগেশ' বিভূতিবাবু 'রমেশ'। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন, মানিয়েছে ভাল, দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বিভূতিবাবু আমাদের পড়ান। এক কিকে জাল ছিঁড়ে বল পার করে ফুটবলে নাম করেন, ভাল ব্যাক্‌কিপার।

আস্তে কথা কন, প্রকৃতি গম্ভীর, অন্তরে স্নেহস্বতঃ উৎসারিত, তা যে পান করেছে, ধন্য হয়েছে। আমার কাবাডি খেলার, কসরৎ দেখানোর কত প্রশংসা করেন, পড়ায় কত উৎসাহ দেন। হঠাৎ একদিন বিভূতিব'বু উধাও। জানা গেল বিয়ে করার ইচ্ছা নয় তাঁর, বিপিনবাবু জোর করে দেবেন বিয়ে। পিতার অবাধ্য হওয়া চলে না, গা ঢাকা দিয়েছেন। 'প্রবাসী'র ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় দেড়শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। 'রাণুর প্রথম ভাগ' লিখে বিভূতিবাবু পেলেন তা, সাহিত্য সাধনা আরম্ভ হোল। 'বরযাত্রী'র কথক তিনি, 'গড়ের বাদ্যি' বাজিয়ে, 'গ্রাম্য' জীবনদর্শনের দ্রষ্টা। হাসি পরিবেশন করেন দরাজ হাতে সুখের হাসি দুঃখের হাসি, নিজের জন্য অবশিষ্ট কিছু নেই। তিনি দেখালেন—থিয়েটারে পথ গুটিয়ে যায়, পাহাড় গুটিয়ে যায়—টুকিটাকি ব্যাপারও অজানা সম্ভাবনা ভরা। স্বামী পুত্র খেয়ে গেছে, হাঁড়িতে ভাত বাড়ন্ত, অভুক্ত স্বাধ্বীর পানে ঠোঁট রাঙ্গিয়ে লোকের কাছে পতির লজ্জা ঢাকার সার্থক প্রচেষ্টা। বলতে জানলে, আমাদের জীবনী মনোরম উপন্যাসে উৎরে যায়। বাণী-মন্দিরের বড় পাণ্ডা তিনি। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সাহিত্য সম্মেলন বিদগ্ধ গোষ্ঠী নানা আখড়ায় মোড়লি করে ভারতের এধার ওধার ছোটা-

ছুটি করেন। বড় হওয়ার জ্বালা অনেক। এই সংসার-নিরাসক্ত তপস্বীর সর্বস্ব নিঙড়ে নিয়ে আমরা বড় হচ্ছি, সাহিত্য পুষ্ট হচ্ছে, তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারের বুঝি শেষ নেই।

কার ভিতর কি আছে, কে বলবে। ঘোঁৎনার ভাই পটলা আমাদের সঙ্গে স্কুলে যায়। নস্যি টেনে টেনে নাক ভোঁতা করেছে, খুঁনিয়ে কথা বলে। স্কুল তাকে ছাড়ে না, বিরক্ত হয়ে ওসব ফেলে, বাবার দাওয়াখানায় কায়েমী হয়ে বসল, কম্‌পাউণ্ডার বুলাকিলাল তার দোস্ত।

ডারবীর টিকিট এসেছে, দাম সাড়ে সাত টাকা, পটলা বলে চ ভাই, একটা কিনি।

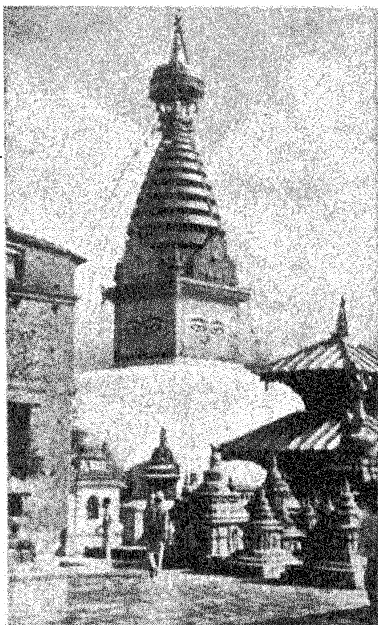
কম্পাউণ্ডারের হাতে টাকা নেই, মাইনে থেকে কাটাবে। দুজনায় মিলে একটা টিকিট নিয়েছে। নাম আর দুজনার রেখে কি হবে, পটলার নামেই থাক।

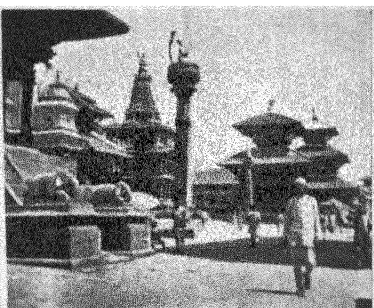
'তার' এল চার লাখ উঠেছে। পটলা বলে দু'লাখ বুলাকির দু'লাখ আমার। বাবা বললেন সে হবে না, শুভানুধ্যায়ীরা বোঝায়, বুলাকির কি প্রমাণ আছে?

পটল অটল, গৃহতাড়িত হোল, কিন্তু বুলাকিকে দু'লাখ পাইয়ে ছেড়েছে। অন্তরের দলিলের কাছে কাগজের প্রমাণ মিথ্যে হয়ে যায়।

লাহিড়ি সরায়ে বেঙ্গল লজ, সবাস হোটেল, ভদ্র বাঙালীর মস্ত অভাব ঘুচেছে। লোটা কম্বল সম্বল করে নোংরা ধর্মশালায় উঠে, স্বচ্ছন্দে বাস করার মনোবৃত্তি বাঙ্গালী আজও আমলে আনতে পারে নি, রুচি বড় বালাই।

বর্ধমান জেলার ম্যালেরিয়ার আসামী যুবক, এখানে এসেছে উকিলের কাছে। ম্যালেরিয়া তো ছাড়ল, লেখাপড়া ভাল জানা নেই, কি আর করে? তেল সিঁদুর ফিতে কাঁটা ইস্তক পেন্সিল কলম নিয়ে বাঙালিটোলায় কারবার ফেঁদে বসল; মূলধন পনেরো টাকা।









উপরে বামে : স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির, সুপ্রাচীন বৌদ্ধ চৈত্য,

উপরে দক্ষিণে : দরবার চক : কাঠমাণ্ডু,

নীচে বামে : পাদদেশে ধানপান, পর্বতে পাষাণ, নেপাল,

নীচে দক্ষিণে : পাহাড়ী সরলতার প্রতীক—নেপালী যুবা।

সদা প্রফুল্ল অক্লান্ত সেবাব্রতী ছত্তিশবাবু আজ বাঙালী বিহারী সকলেব নয়নেব মণি। চ্যাটার্জি ব্রাদার্সেব মনিহারী দোকান আব বেঙ্গল লজ সবাইব মিলনতীর্থ। ছোট বড় যে আসে, সেই আনন্দ উৎসেব ছোয়াচে স্নিগ্ধ হয়ে যায়। উৎসবে ব্যসনে বাজদ্বাবে শ্মশানে, সকলেব বান্ধব সতীশচন্দ্র। দ্বাবভাঙ্গায় প্লেগ, স্কুলে নবেনেব খুব জ্বব এল, গায়ে দারুণ ব্যথা, একটা কুচকি আগুবেছে দেখে সন্দেহে সকলেব মুখ হয় কালো, গোষ্ঠবাবু তাকে স্কুল থেকে তুলে এনে বাড়িতে বেখেছেন। তাঁদেব সেবা যত্নে নবেন সে যাত্রায় বক্ষা পায়। মহানুভবেব প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হয।

নেতা নিতুকাকা ডন কুস্তি কসবৎ কবানো। ভোবে যে আগে উঠবে, বাকি আব সবাইকে কিলিয়ে ওঠাবে সে, তাব আইন। আমবা কে কাব আগে উঠব, চিন্তা নিয়ে শুতাম, ভোবে ওঠা অভ্যেস হয়ে গেল।

ভায়েবা মধুবনী স্কুলে পড়ে, বাসা কবে আছে, আমি মধুবনী এসেছি। বামুনঠাকুব মৈথিলি, বাতে ভাল কবে মাছ বাঁধতে বলা হোল। ভাত খাচ্ছি, ডালেব পর মাছেব বাটি টানতে, কালো জল টলটল কবে ওঠে। বাটিব তলা হাৎড়ে পেলাম, কালো করে পোড়া গোটা ল্যাটা মাছ, আঁস কান ফেলা হয় নি। বাচ্ছা বাঁদব পুষেছে একটা। কাউকে কাছে পেলে, পা লেপটে পড়ে থাকে, ছাড়াতে গেলে চ্যাচায়। মাব পেট আঁকড়ে ঝোলা স্বভাব কিনা, ভায়েবা পায় ঝুলিয়ে বেড়ায়।

মিউনিসিপ্যালেব লোক এল, বাসায় নম্বব মাববে, ছেলেরা বাসায় নেই। কে আছেন বলে বাবান্দায় উঠে আসতে, ঘব থেকে কী একটা ছুটে এসে ধবেছে পা জাপটে। আঁৎকে ঝাড়তে ঝাড়তে পা, ছুটে রাস্তায় উঠে গিয়ে, আর ওমুখো হয়নি। মধুবনীর বাবুসাহেব যাবেন দ্বারভাঙ্গা। টিকিট কাটা হয়েছে গাড়িতে বসেছেন, খেয়াল

হোল—গাড়ি তো বিগড়ে যায়। তাতে আর সন্দেহ কি—মোসাহেবরা বললে—সরকার, এতো আকছার দেখাই যাচ্ছে, ইঞ্জিন বিগড়োলেই গাড়ি অচল, পড়ে থাকে।

নেমে পড়লেন, গাড়ি চলে গেল।

চড়লেন মোটরে—হ্যাঁ হে, আজকে পৌঁছুতেই হবে, মোটর বিগড়ুলে কি করব?

আজ্ঞে, সেও একটা কথা বটে, মোটর বিগড়ুলে, সরকার পৌঁচুচ্ছেন কি করে?

আন আর একটা। আচ্ছা, এরই বা ভরসা কি, এও তো কল। এলো আর একটা। পর পর তিনখানা মোটর নিয়ে বাবুসাহেব চলেছেন দ্বারভাঙ্গা, বিশ মাইল পথ।

পাটনা কলেজে সঙ্গী বিম প্রিয় মণি। এই মণিটি বাস্তবিক মণি, স্বনামধন্য প্রিন্সিপ্যাল নরেন রায়ের ছেলে। যখনই দেখি, একখানা বই হাতে, কলেজ লাইব্রেরীর ইংরাজী সাহিত্যের যত বই, মণি একে একে পড়ে ফেলেছে। খাঁটি বামুন প্রিয়, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী না করে জলস্পর্শ করে.না। সবকটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান তার জন্য আগা গোড়া রাখা থাকে। পড়া শেষে মণি গেল বাবার কলেজ রিপনে পড়াতে, বিম হোল পুলিস, প্রিয় আয়কর অফিসর। হোস্টেলের হিরেঠাকুর তালেবর লোক। ছেলেদের তোয়াক্কা করে না, বহুদিন হোল আছে, হরেক রকম দেখেছে। লম্বা চওড়া গড়নেব খাঁটি ভোজপুরী, হাজার রাগ কর, রা কাড়ে না, মুখে চিকণ হাসি, পালা করে ম্যানেজার হয়, আমার পালা এসেছে। খোদ সামলাব, দেখি, ঠাকুর চুরি করে কি করে? মাইনে পায় পনেরো মাসকাবাবে বাড়ি পাঠাবে ত্রিশ, তার ফারাম আবার আমাদের দিয়েই লেখানো চাই, রসিকনাগর!

পনেরো দিনের বাজার এনে ভাঁড়ারে আটকালাম। বসে থেকে মেপে

মেপে দিচ্ছি সব। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে, হিরে কি আর না হেসেছে, দেখি নি। প্রথম ব্যাচের ছেলেরা খেয়ে এল, কোন গোল নেই, দ্বিতীয়বারে জাগে হৈ-হক্কা তুমুল কলরব—ডাক ম্যানেজারকে।

গিয়ে দেখি, ছেলেরা মাছ বলতে, ঠাকুর কাঁচা মাছ এনে হাজির করেছে—তেল নেই মাছ ভাজা হয় কি করে।

মেপে তেল দিলাম, মাছ ভাজা হোল না, কারণ কি? হিরে, গোবেচারার মত মুখ, তার কথা—এক খেপ মাছ ভাজতেই সব তেল লেগে গেলে, বাকি মাছ ভাজি কিসে, বলে দেবেন তো। এ্যাসিস্টেণ্ট ঠাকুর চাকররা সব চশম্‌দিল সাক্ষী, হলপ কবোল করতে ফরিয়াদ নাকচ হয়ে যায় সহজেই। ছেলেরা চেঁচায়—আন দই, আন মিষ্টি, আমরা মাছ পেলাম না। কতকগুলো টাকা গচ্চা গেল।

একে সামলাব, সাধ্য কি আমার, খুরে নমস্কার। সব ছেড়ে দিয়ে বাঁচি, যেমন চলছে চলুক।

হস্টেলের দলপতি গোকুল, নষ্টামীর বৃহস্পতি। পাটনা কলেজে বাছা বাছা ছেলে নেয়, তাদের বখানো গোকুলের একমাত্র কাজ। ভোলা, আমি এক রুমে আছি। ছুটির পর বাড়ির ঘী এনেছি, সুজি কিনেছি, স্টোভে হালুয়া করে খাব। কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি, দোরে লাল কালিতে লেখা বড় নোটিশ টাঙ্গানো—নেপালী ঘী উত্তম।

অনুষ্ঠান বৃহৎ ছিল, ঘী সবটুকু খরচ হয়েছে। লে হালুয়া! হস্টেলের বনেদী বাসিন্দে প্রমোদ, বাপ রাঁচির সরকারী উকিল, বড়লোক। ভারি হিসেবী ছেলে, বাড়িতে রেজিস্টার রেখেছে, পারসেন্‌টেজের বেশী একটি দিনও যাতে ক্লাশে গিয়ে না বসে। আইয়েতেই দু'তিন বছর গড়াচ্ছে।

পাটনায় ছটপর্ব এক দর্শনীয় ব্যাপার। সাঁঝের ঘোরে বাজনা বাজিয়ে ধামা মাথায় হাজারে হাজারে আসে পূজার্থিনীরা, গঙ্গার কূল

লক্ষদীপে ঝলমল, অভাবনীয় সমাবেশ, সুন্দর দৃশ্য। স্নানান্তে পতি-পুত্রের মঙ্গল কামনা করে, ধামা ধরে চাঁদের দিকে তুলে। পথে যেতে অকিঞ্চনকে প্রসাদ বিলোয়, ইঁটের মত শক্ত চালের গোলা আর কড়া পাকে তৈরী গমের ঢাল—ঠেক্‌বা, ভূষ্‌বা। ভাবি, ললনাদের এত বিদ্যে ছিল জানা, দেশ পরাধীন, কি করে হয়? মর্দগুলোই কাজের নয়। রসদ হাতিয়ার একাধারে, গুটিকয়েক খা, বাকি ক'টা নিয়ে ভিঁড়ে যা, দেখি, কে আঁটে? লড়াইয়ে এলেম শেখাতে আসে কর্নেল হাইড্‌, কাপ্তান হুড্‌, ইউনির্ভাসিটি ট্রেনিং কোর হয় দাঁড়া। লেফট্‌ রাইট্‌ করি, রাইফলদাগা ফরমফোর্স তালিম পাই। এবারে ফরমে সই দাও, কর সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য—সাগর পারে জঙ্গভাগারে যাওয়া অনিবার্য। ছেলেরা বসে বেঁকে, বিদেশে কেন লড়তে গেলুম মোরা, দেশের অসময়ে ধরি অস্ত্র। হাইড্‌ বোঝায়—জবানের সিনাতানা, বদনচোস্ত, নজর আসমানি মুখে রা নেই—পল্টনের আদর্শ বটে এই। তর্ক করলে ভণ্ডুল তর্কবাগীশ নিয়ে পল্টন হয় না। প্রিন্সিপ্যাল হর্ন বলেন—রাজভক্তি উচ্চাঙ্গের গুণ, সম্রাটের আদেশ চরম, সর্বথা মান্য।

আমরা অনড়, সর্তটা উঠিয়ে দিতে হোল।

পাদদেশে ধানপান,

পর্বতে পাষাণ,

নেপাল

মধুবনীর গায় সৌরাঠ।

কাল শুদ্ধ থাকলে লক্ষ বামুনের সভা বসে, মৈথিলি বিয়ের কথা পাকা হয়। কুল্‌জি নিয়ে বসে শুঁড়ি পাঁজিয়ার, যত সব কুল-পরিচয় লেখা থাকে তাতে। ঘটক মারফৎ কথা পাকা হয়ে, কুলের নিরিখ মিলিয়ে নিতে কর্তারা পাঁজিয়ারের কাছে যাবে।

বিয়ে স্থির হতেই বরকে নিয়ে শ্বশুর গেল ঘর, সঙ্গে রইলো হয়তো ওঝার এক আধটি অতি নিকট জন। বাড়ি পৌঁছে বরকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে ঘরে তুলেছে, রাত্রেই বিয়ে। কোন আড়ম্বর নেই, কেউ জানলো না, ঘর বর দেখা, মেয়ে পছন্দ, এ সব বালাই তো নেই-ই।

ওঝা এখন জামাই, পাহু নেই। চোখে তার 'সোহাগগাজল, মাথা চাদরে ঢাকা, কোটরে বাস করে। মধুর মাখান খায়, পিক ফেলে পাঁচিল রাঙ্গায়, অপরে ও চাঁদ মুখ দেখতে পাবে না। ছিল পুরুষের মাঝে পুরুষোত্তম, হয়ে যায় ভেড়ার অধম, সখিজনের তাঁবে আছে, বাইরে যেতে মানা। কলা চৌষট্টি হাসিল হতে যায় মাসটি, জাদু মোহনীয়া পদার্থ কিঞ্চিৎ বাকী রাখে না। এখন বাড়ির যে কেউ এলে বিদেয় চেয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। বাবাজীর বিদাই-দুধেল গাই, পগ্‌গ দোপট্টা মেরজাই, জোড়া বলদ, অন্দরে আটক থাকার খেসারৎ।

নিতুকাকা মিথিলায় মানুষ, নির্ভুল মৈথিলি বলে। দুষ্টু বুদ্ধি চেপেছে

মনে, কয়েকজন মিলে সভায় গেল।

কাকার চন্দনচর্চিত ললাটে সিঁছুরের টিপ, চোখে কাজল, গালভরা পান, মাথায় পগ্‌গ। লাল ধুতি মেরজাই পরে গ্যাট হয়ে বসেছে। গোপলার কদমছাঁট চুল, একগোছা টিকিতে জুৎ করে বাঁধা আছে ফুল। কপাল ছাইলেপা, তারপর সিঁছুরের ফোঁটা জ্বলজ্বলে। মের-জাইর ফাঁকে লাল পৈতেয় তামার আংটির সঙ্গে রুদ্রাক্ষ ঝোলানো। সাঁচি করে রাঙ্গা ধুতি পরা, গালে পানের পুঁটুলি ফোঁড়ার মত হয়ে আছে। ঘন ঘন পিক ফেলে, বড় ভাইয়ের ভারিক্কি চালে সম্বন্ধের কথা পাকা করতে লেগেছে। চৌকোশ এক ঘটক জুটে ফাঁক ধরার উপায় থাকে না, হয়ে যায় বিয়ের কথা পাকা।

'খররেভৌর', কৌলিকমান শুনে শ্বশুর আহ্লাদে গদগদ। এ যে দ্বারভাঙ্গা রাজার কুলকৌলিন্য, তাঁরা তো মোটে 'কুসুমেরি সুবাস'। একথা হলে তাঁর মূল মর্যাদা বেড়ে হবে তের হাত।

বরকে লুফে নিয়ে বাড়িমুখো হোলেন, সঙ্গে গেল বরের ডান্‌পিটে সাকরেদ হাবুল। অভ্যর্থনার তার, ত্রুটি কিছু হয় নি। গাঁয়ে ঢুকতেই, যে পায় তাকে, কাঁধে পিঠে ঝুলে পড়ে। ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বেচারা প্রাণ নিয়ে লাগালো ছোটাছুটি। রং মাখিয়ে ভূত করে, গ্রামীন মেয়েরা দিচ্ছে অশ্রাব্য গাল। সে যে ওঝাজির ছোট ভাই, আপামর সাধারণের ঠাট্টার পাত্র।

দোরে পা দিতেই নিতুকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে অন্দরে এনেছে। গোধূলি লগ্নে অঙ্গনে 'মরপামণ্ডপে' বসিয়ে—আহে মাধব গেলা শ্বশুরার—গলাগলি করে ঐক্যতান তোলে সখী সব। গান গেয়ে বরকে বরণ করলো কুলবধূরা।

বিধ্‌ আচার সব সাঙ্গ, এবার হবে বিয়ে। বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, নিতুর মুখ শুকোয়। হঠাৎ নাপিতের সাজে হন্তদন্ত ছুটে এল মোট্‌কু —হাবুলকে চাই। ছজনায় গোপন পরামর্শ করে, হাবুলের মুখ

আঁধার ঘেরা। মেয়ের বাপকে ডেকে বলছে—ব্যাপার সঙ্গীন, আর এক তাবিখে দিন ফেলুন এ যাত্রায় বিয়ে হয় না, ববকে এখনই বাড়ি যেতে হচ্ছে। বাপের কলেরা, সংবাদ দিতে এল যে এই নাপিত মোট্‌কু। গীত স্তব্ধ হয়ে বিয়ে স্থগিত হয়।

ববকে তুলে সঙ্গে সঙ্গে বিদেয় হোল ববযাত্রী মোট্‌কু। হাবুল পথে যেতে নিতু বলছে—আব একটু হোলেই হয়েছিল আব কি! আমাব তো ভাই, ভয়ে হাত পা সেঁদিয়েছিল পেটে। জানাজানি হোলে, নির্ঘাৎ মেবে ফেলতো।

হাবুল বলে—আব ইয়ার্কি দিতে যেযো না, খুব বাঁচা বাঁচলে। কোথায় কে বক্তিমে ঝেড়েছে, ট্রাক্‌টব কিনবে তেলি। বিষাণসাব ভগবান দত্ত ছেলে, সাকিম তবাই জঙ্গল পাশে লোহাব পাটি।

হাতি এনেছে একটি নিজেব নমুনা মিলিয়ে, আমাকে নিয়ে যাবে। বোঝালাম, কলকাতায মেলাই ট্রাক্‌টব কোম্পানী আছে, তোমাব যেটা পছন্দ, লিখে দিই এসে যাবে।

হাতি ঘোড়া গ্যাখে, পয়পালা মিলায়, দবাদবি কবে, সে তোমাব ক্যাটালগ প্রাইসে মাল নেবে নাকি? আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবেই।

বাড়ি গিয়ে দেখি, বৃহৎ অট্টালিকা তুলেছে, পোখবিপাটন ডিজাইন, চতুর্দিকে ঘেবা আঙ্গিনা। কোঠা সব ক্ষুদ্র, মাথাব উপব বসানো, ফোঁকড়েব দোষব গবাক্ষ, যা অন্ধকাব কাটে। মানুষ ববাবব বাতায়ন, জেনানার পর্দাফাঁস! সাধাবণেব নজব এড়ানো যায না।

বলি—দেখলেই বা, ক্ষয়ে তো যাবে না। আব, কাব এত গবজ, বাত দিন তোমাব ভেতব বাব দেখে দেবে, মজুবি চেয়ে বসবে না? ঝুমচাষে বন কেটে সাফ কবে থাকু। হাজাব বছবেব পচা পাতার ওপব সবষে ক্ষেত। কোষা পুরু হতে জমি ঢেকেছে, তুলে আছাড় দিলেও ব্যথা লাগে না।

তেলি মাঠের মাঝে ঘানি ঘোরাতে লাগে। থারু ছটাক পোয়া আনা পয়সা জানে না, নিয়ে এল ধামা ভরা ধান—তেল দাও। যা পেল মহা খুশী। গায়ে মাথায় মাখে, প্রেয়সী বিনোদবেণী বাঁধল, ব্যঞ্জনে ফোড়ন ছেড়েছে।

তেলি মোটা হোল। হতচ্ছাড়া থারু, অসময়ে হাত পাতে ধার পায়। জমিজিরেৎ সব এখন তেলির, জমিদারি কিনে মহাজন হয়ে বসে। থারু আবার জঙ্গলে ঢুকে গাছ কাটে, সরষে ছড়ায়।

খাঁড়া মারে থারু। নদী থেকে খাল কাটা হচ্ছে, জল আসবে ধান চাষে।

মাটি মাপা হোল, ছেলে বুড়ো সমান সমান ভাগ, ভেদ নেই। কেউ পিছিয়ে আছে, কাজে ঢিলে-ঢালা ধরা পড়েছে, তাকে অপদস্থ করতে অগ্রসরেরা তার হাঁস মুরগী লুট করে, খাঁড়া মেরে ভোজ লাগাবে। ঢিমে তেতলার ভাগ্যে—ছুয়ো হারুয়া—ধিক্কারের নেই লেখাজোখা, *প্রাণ ধারণই নিরর্থক তার। কাজে অপটু থারু, ধিক তার জীবনে।* অরণ্যচারীর অলিখিত বিধান, বিধির বিধানের উপরে।

বাপ বুড়ো হয়েছে, মুখে মানে না। কাজে পিছ্‌পা হবে নাকি? তাকেও তো সমাজে বাস করতে হয়। ছেলে ব্যাটার উঠতি যৌবন, বাহুতে অমিত উদ্যম, কাজে এগিয়ে চলেছে।

বাপ বলে—বাছনি, মুই ছ্যাখ্ পারিনি। খাঁড়া মারবে এখুনি, মোকে তুই এগিয়ে দে।

এখন তো ঝাড় বাঁধে নি, গোঁফের আড়ালে ছেলের মুচ্‌কি হাসি ধরা পড়ে যায়। উদ্যত খনিত্র বৃদ্ধ, পোলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—নেমক্‌হারাম, শেষ করব তোকে। মুই বড় করি নি? তুই মোর অপমান দেখবি, সে হতে দিবনি।

কাজেরবার' অক্ষম অন্ধ বৃদ্ধ সমাজ সহ্য করে না। সাঁঝের আঁধারে পার করে এল জঙ্গল পারে অন্য বসতির এলাকায়। তারাও দিনমানে

আহার যোগায়, বেলাশেষে রেখে আসে ওপারে ভিন্ন সীমানায়। হাতফের হতে হতেই অক্ষম আতুরের জীবনদীপ নিভে যাবে। কাজে না লাগলে, তার বোঝা আর কে বয় বল? চালান করবে বারোয়ারী ব্যবস্থায়, যে ক'দিন খেয়ে বাঁচে। অক্ষমের তরে কর্মবীরের নেই করুণার অবশেষ। এমনি একটি থারুমহাশয় আমার নজরে পড়ে গেল আঁধার ঘোরে ধাপ্ধাড়া গোবিন্দপুরের মাঠে।

মমতায় ওতপ্রোত আমার মন, তার কিন্তু নেই নিয়তির পরে কিঞ্চিৎ বিক্ষোভ। সহজভাবেই মেনে নিয়েছে এ পরিণতি।

এ বাজিয়া, এ কোথায় আন্‌লি রে? কৈ, বসে খাব নাকি, কাজ দে।

থারুর কাছে থারুমাত্র মনৈ-মানুষ, আর সব বাজে, বজিয়া। বলবার অধিকার আছে বৈকি। গেরস্থের দ্বার অহোরাত্র উন্মুক্ত। দোরে আগল দেয় না, চুরি জানে না, মিথ্যে বলে না এরা। কী আর করবে, চোখে ছ্যাখে না যে, দড়ি পাকাবে। যে ক'দিন বেঁচেছিল, জাগরণে দেখি, পাকিয়ে দড়ি লম্বা করে চলেছে।

সাউজির ছেলের বিয়ে, নেমন্তন্ন করতে এল স্বয়ং। সোনার থালায় রেশমী রুমাল ঢাকা, চাঁছা গোটা নারকোল সুপুরি। তবকদার সুগন্ধি পান আতর দুহাতে এগিয়ে ধরে—বরযাত্রী হয়ে, কৃতার্থ করে, সমারোহের শোভা বাড়াই যেন।

লাঠি মেপে কন্যে বাছাই হয়েছে। বর উঁচুতে যে গিরে পোঁছোয়, কন্যে তার চার আঙুল নিচু থাকবে। বয়সের কি আর গাছ পাথর আছে, কে তার হিসেব রাখে? বর জন্মালো, ধর, দুই যে সনে বড় ঝড় এল, কন্যের জন্ম, সে বছর দারুণ কুমড়ো ফলেছিলো। কালো কি ফর্সা, কে মাথা ঘামায়, দানদাহেজ ভাল দিলেই ভাল।

গিয়ে দেখি তুল্‌কালাম কাণ্ড, বরযাত্রী চলেছে, ক্রোশ দুই লম্বা প্রসেশন। আঙ্গিনায় উনুন খুঁড়ে রান্না, উঠোনে খাওয়া, কে চেনে

কাকে, জাত জন্মের খোঁজই বা নিচ্ছে কে ? মচ্ছোব চলে, লোক আসে খায়, স্তূপ থেকে একটি পতাকা তুলে মিছিলের পিছনে দাঁড়ায়। ও মুড়ো সমধিব গায় না ছোয়া পর্যন্ত বুঝি ববকর্তা নড়বে না।

হাতি ঘোড়া পাল্কী, তল্লাটে যার যে কটা ছিল, জড়ো করা হতে, যেটাতে যে পেরেছে, চেপে সঙ্গ নিল। ঢাক ঢোল কাঁড়া-নাকাড়া দিশি বিলিতি হরেক রকম বেজে চলে। নাটুবা ঝাম্‌বাজা, একপাক ঘুরতে এক হাঁটু ধুলো ছড়ায়, তারাও এগুতে লাগল।

ও গাঁয় পৌঁছে, বরযাত্রী মারমুখো হয়ে, বাজনার তালে খটাখট্ লাঠিসোঁটা কিরিচবল্লাম উঠছে বেজে। হাতির খোরাক, ঘোড়ার দানা দিতে, কিন্তু কি করছে ব্যাটারা ? গোলা ভেঙ্গে উজোড় করে নিয়ে এস সব। মাঠে যব ছোলা কলাই মটর লাগিয়েছে, চড়িয়ে উপড়ে সাফ করে দাও—তাই হোল।

কন্যেকর্তা হাত জোড় করে এসেছে, তাদের আদর আপ্যায়ন যৎ সামান্য, স্বীকার করতে হবে।

হাতির কানমেপেই পুরি গড়া হয়। গায়ে তাপ স্পর্শ হোল কি হোল না, ভেতরটা আঁচ পর্যন্ত লাগে নি, ওজন একটার আধসেব। সঙ্গে আলুর শুক্‌নো তরকারি আর জলে ভিজোনো আমের আচাব। ঝাঁঝালো দই-এর সঙ্গে মুংবামেঠাই, বেশ দমার। কবে গড়েছিল, কে জানে। শালপাতা পেড়ে, তাই সাবাড় করছে সব, কেউ দু সের দই, মুংবা দেড় ডজন। খাবার আদর যেমন তেমন, এবার যা আপ্যায়ন লাগাল, তার ঠেলায় প্রাণ যায়। রং ঢেলে গা ভিজিয়েছে, কে যেন গায়ে বিছুটি লাগিয়ে দিয়ে গেল, বরযাত্রী তড়পাচ্ছে, দেখে আনন্দ। সম্বন্ধির মাথায় গোবর ঢালা হোল। তাতেও মন ওঠে না, চষাখেতে ঠ্যাং ধরে মই লাগাতে লেগেছে। আর যারা এসেই হৈ হল্লা বেশি ছেড়েছিল, তাদের চিনে ফেলছে। ধরছে, আর

কাঁধে পিঠে ঘোড়া চাপছে। প্রাণ অস্থির, কে কোথায় পালাবে, দিশে পায় না। গালাগালি চেঁচামেচিতে বিয়ের রাত্রি উদ্বেলমুখর। কথায় বলে—যার বিয়ে, তার মনে নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। ববকনে, এতসব উজ্জোগ আয়োজনের বিন্দু বিসর্গও খবর রাখে নি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ; বাচ্চাই তো।

সুরতিয়াকে জয়নগর পাঠাচ্ছি।

মনিঅর্ডার যাবে, জরুরি চিঠি আছে, পোষ্টকার্ড আনা দরকার—চিঠিটা আজই যাবে, যাবার মুখে ইষ্টিসানে ফেলিস্। মানিঅর্ডার করিস্, আর এই একটাকার পোষ্টকার্ড, বুঝলি তো? সকালে গেল লোক, সন্ধ্যা ঘনায়, দেখা নেই। রাত করেই ফিরে এলো, খিদে তেষ্টায় শুক্নো মুখ নিয়ে।

—কি রে চৌপর দিন ছিলি কোথায়? রসিদ দে, পোষ্টকার্ড এনেছিস্?

—তা আর পেলাম কোথায়? সবকটা দোকানে শুধোনু, পোস্কাঠ রাখে না। এক ব্যাটা শুধ্ বললে—নেবে কিসে, থলে এনেছো? কইলাম, দাও না, কাঁধে করেই নিয়ে যাচ্ছি। দিলে না, থাকলে তো দেবে, মস্করা করল আর কি।

—সে যা হয়, হোল, রসিদ কৈ? চিঠি ফেলেছিস্ তো?

—সে আর বলতে। টাকা আর ফারাম দিয়ে দোকানিকে বললুম, ছাপমেরে রসিদ কাট। এই দেখুন, কেমন লাল ছবিওয়ালা কাগজ! চিঠি ইষ্টিসানে ফেলব, ঢুকতে দেয় না। বলে—গাড়ি এসেছে, টিকিট দেখাও। একটা নুড়িতে বেঁধে চিঠিটা ছুঁড়ে, ইষ্টিসানের এস্পার উস্পার করে এসেছি।

কালগতি, বুড়োবাপ মরতে মাইজন জাতপঞ্চ নিয়ে এসে সাউজির

গলায় উত্তুখল ঝোলালো।

বুকে কাঠের বোঝা নিয়ে তেলি, করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে—অজন্মা, জমিদারির আয় কম, মণ্ডল নেমন্তন্ন করতে সে পারবে না। পরগণা নিয়ে কাজ সারা হোক।

ব্যাটা সুদখোর, প্রজা ঠেঙিয়ে পয়সা করেছে, বেল্লিক বলে কিনা সেরাদ্দ, অল্লেতে সারবে। বলি, হারামজাদা, বাপ কি কারো দুবার মরে রে? এখন ক্রিয়াকাণ্ড করবি না, তো, করবি আমি মলে?

গণ্ডগোল কথা কাটাকাটি অনেক অন্তে, দু'পরগণা সভা নবৎ, ঘর পিছু একজোড়া ধুতি, একটি ঘটি বিদাই। চিঁড়ে দই সঙ্গে জিলিপি ভোজ, স্থির সিদ্ধান্ত বের হতে, দুদিন পঞ্চাশ পঞ্চান্ন অনুচরসহ সাউজির ঘাড়ভেঙ্গে খেয়ে মাইজন বিদেয় হয়।

একমাস পর শ্রাদ্ধ।

বুড়ো মরার সঙ্গে গাঁয় গাঁয় দই পাতা হয়ে এসে ভাঁড়ারজাত হচ্ছে। কুটুমেরা খবর পেয়ে, দই চিঁড়ে কাপড়চোপড় পাঠাতে লাগলো। চিঁড়ে চিনি আটা সুস্থির আছে, দই ফুঁসে পাতিল ছেড়ে পালাতে চায়। এক পাতিলের দু'পাতিল হোল, তাই কি বাগ মানে? পাঁচশো পাতিলে দই, সকলে তার তদারকিতে লেগে আছে।

শ্রাদ্ধের আগে ষাঁড় দেগে ছাড়া হয়েছে, গাঁয়ে একটা উপদ্রব বাড়লো।

লোক খাবে কয়েকহাজার, দিন তিনচার আগে থেকে জিলিপিভাজা চলে। দেড় দুপো আটার ধ্যাবড়া প্যাঁচ, কিঞ্চিৎ চিনিররসে জড়ানো। টেনে ছেঁড়া দায়, ভাজা হয়েছে সামান্যই। চাল, তাড়ার চোটে হয় আধেক ধান, আধেক চিঁড়ে। তাতেও দেখা দিলে অনটন, হবে ধান মিশিয়ে ক্ষতিপূরণ। আপত্তি নেই ইথে, কাজটা বিধিসম্মতই। নাপিত গাঁয় গাঁয় 'হাকার পাঁতি' দিতে ঘটি হাতে হাজারো জাতভাই জুটলো এসে। এদিকে তাদের তরে মাঠভর

লাইন-বরাদ্দ পাতা, চিল্‌তেছেঁড়া কলাপাতা, বস্‌তে আছে খড়ের এক একটি নুড়ি।

জায়গা, সাউজির মিলের উঠোন, পাঁচিল-ঘেরা, তাই রক্ষে। কে চিনল কাকে, বাইরে লোক ভিড় করে এল, ঘটিহাতে ভোজ খাবে। সন্ধ্যে হয়েছে, মিলের গেটে দারুণ জটলা, সে যেন কী, কিসের মেলা। একদল খেয়ে গেল, সকরিঘুচোতে কি তর সয়, হুড়মুড় করে আর এক দঙ্গল বসে যায়।

এ পরম্পরা চলবে রাতভোর। না হয় নেই ব্যবস্থা আলোর, তাতে কি বা এসে যায়, অন্ধকারে ভোজ জমে ভাল। দান দক্ষিণে খাওয়া বিদেয় সারতে সাউজির একলাখ কমল। বিলিতি ডেথ্‌ট্যাকস আমদানি করে পণ্ডিতজী কী বাহাদুরী নেবেন, মাইজনেরা এ পরিপাটি চালিয়ে এসেছে চিরকাল।

ইহ নরহরি সংবাদ।

নরহরি উপাখ্যান, অমৃতসমান, শোনে পুণ্যবান। বলে কে ?

ঐ বল্‌ছে, শোনো।

'ও পরবতীয়া ডোকো,

চিল্লর মারি মারি টোকো।'

ঝুড়ি পিঠে ঐ পাহাড়ী যায়

চামউকুন বাছে আর খায়।

দাঁড়া তো আবাগীরব্যাটারা—তেড়ে যেতে 'মদেশীবটুহরু' দেশবালি চ্যাংড়ারা পথ নিল।

ওদিককার দল খেদিয়ে এসে দেখে, এদিকে এক দঙ্গল, একই বচন, ঐ স্বর। পাগল না করে ছাড়বে না দেখছি। গাঁ বসতির কাছে-কিনেরে যাবার যো নেই, কুলাঙ্গারগুলো, চ্যাঁচাচ্ছে দেখ !

'বোঁ ওয়াওয়া'

গন্ধগায় বুড়ো ছাগল বটে। কর্তা ছেড়ে রেখেছেন ছাগলটাকে। বড় শিং ঝাঁকড়া লোম, গা-গতরে ভারিক্কি হয়ে প্রবল প্রতাপে দিগ্বিজয় করে বেড়ায়। কাছে যাবে কে? সামনের পা'দুটো তুলে—বোঁ ওয়া ওয়া করে শিং উঁচিয়ে তেড়ে মারতে আসে।—নরহরি, ওটাকে দূর করে দাও—কর্তা হুকুম করেন।

কাছে যেতে অজ আওয়াজ দিয়ে যুদ্ধং দেহী করে এসেছে। তা, বাহাদুরী দেখানো চাই তো, লাফ মেরে পাঁঠার শিং দুটো ধরে কষে চেপে। অজাযুদ্ধে পরবতীয়া পরাস্ত হয়েছে। ভূঁইয়ে পেড়ে ফেলে, উরু চিরে দিল শিং-এর ঘায়।

ঝেড়ে উঠে, দে তাড়া, পাঁঠা পালায়। হাঁটু বেয়ে রক্তেরধারা চলে, রাগ যায় না। বলছে ও বোকাকে যা করতে হয় আমি জানি, দেখবে মজাটা!

কী রাগ! এতেই যা মুখরক্ষা হয়।

বীর নরহরি রাজা নয়, উজিরও না, এই পাঁচজনের একজন! মাহাত্ম্য অপার, কিঞ্চিত বাখানি তার, শোনো দিয়া মন। জন্ম মহাভারত পাহাড়, এলাকা ও খলচুঙ্গা, কর্মক্ষেত্র সম্প্রতি তরাই নেপাল। দুনিয়া যাহাই করে থাক্, ঈশ্বরের হাত দিয়ে নরহরি আসে প্রিয়দর্শন হয়েই। উঁচু মাথায় তিলফুল নাক, কালো ভুরুর নিচে পটলচেরা চোখ, গাল রাঙ্গা দুটি আপেল যেন। মধুর অধরে হাসি লেপ্টে আছে। মাথায় চাঁদিঘেঁসে টুপি পায়ে আঁটো উপর ফাঁপা পাৎলুন, আংরাখা জানুবেয়ে নিচে নামে। কোমরে পাঁচগজি সরু-চাদর, কুকরি ধরে জড়িয়ে রয়েছে। 'মান্থেখানেকুরো' মরাখেকো কালাদের হিজিবিজি কথা বোঝা যায় না। মাতৃভাষার দাপট্ কম নয়, কোমরে কুকরিবাঁধা, জমিয়েই থাকে।

'এ মরারা কিসের বড়াই করে, হ্যাঁ, রেলমোটর পাহাড়ে অলিতে গলিতে ফেরে। ঘাস কাটতে কাটা গেছে আঙুলটা, সে আবার এমন



বাগমতী তীরে ৺পশুপতিনাথের ঘাট

আলোকচিত্র—মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কাঠমাণ্ডু



কাঠমাণ্ডুর বড়বাজার "ইন্দ্রচক"

আলোকচিত্র—মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কাঠমাণ্ডু।

কি ? ইসারা করছে ছাখো না। কি হোল ; তোবা বুঝবি কি ? 'খোয়া গেল সেবার মোটর হাঁকাতে গিয়ে।'

'বাজে, এ বাজে' বল দিকি, মহাখুশি। গলে গিয়ে, যা চাও, দিয়ে দেবে। দিক্ করেছো কি, ধরলো কুকবি চেপে।

ন করা, ন করা মবাহো—মেলা চেঁচাস্ নি নিবুংশেবপোরা, মেরে ফেলব জানিস্ —রুখে দাঁড়ালে, কাছে ঘেঁস্‌বে কে ?

উত্তবাখণ্ডের মহাভাবত পর্বত হিমপুবী, নাওয়া ধোয়া নমো নমঃ কবেই সাবতে হয়, গায়ে একটু যা বোট্‌কা গন্ধ ছাড়ে। তা, টিকাচন্দন ; কপালময় লাল-হলুদ বংবেবং ছাপ ছোপ্। টুপিটা তেল খেয়ে ওয়াটাব প্রুফ, তাব চাপে আটকা পড়ে প্রসাদী ফুল ঝুলছে কানেব পাশ ঘেঁসে।

বাজে মানে বামুন যে, শালগ্রাম নিত্য পূজো কবে। টুপিটা খুলে জলেব আল্‌তো হাত বুলিয়ে নিয়ে টিকি বেঁধে হোল 'চোখো' পবিত্র। এবাব পূজোয় বসলে আটকায় কিসে ? হবে বাম হবে বাম, শিব শিব বাম রাম জপ আব অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টাধ্বনি। হবিহব একাকাব যখন, পূজো জমজমাট, হঠাৎ কর্তাব ডাক-এ বাজে, ভাতপাকেও-রান্না হোল ?

শুনে বাজে নেংটি কষে, এক লম্ফে 'ভাণ্ডাখণ্ড' হেঁসেলে ঢুকে পড়ল। সেলাই কবা কাপড় পবে বান্না কবা চলে না।

হেঁসেল অল্প উঁচু আল দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কবা আছে। আল মাড়ানো শাস্ত্রে মানা, লাফ মেবে ডিঙ্গিয়েই ভেতব বাব কবা বীতি। তা, শীত যত দুর্দান্তই হোক, ববফ পড়ুক, দিগম্বব বাজে নেংটি সম্বল করেই পাক করবে—ডেলা ডেলা ভাত, কালোমাসেব ডাল, কালো তাব্‌কে কড়াতে কালো কবেই বান্না কবা। কালো কাঠিব মত শুক্‌নো শাকপাতার ঝোল নিয়ে ডাল ভাত উনুনেব পাশে বসে সপাসপ্ আহার কবে, মুখ পুড়িয়ে পুড়িয়ে। খাঁটি উপাধ্যা বামুন,

ভাত বাঁ হাতে ডেক্‌চি থেকে কেটে তুলে ডান হাতে খায় চৌকায় বসে। *টানা ভাত অমেধ্য, অখাদ্য তার।*

বাজে চলেছে দেওয়ানজির সাথে পশ্চিমের জেলা কোর্টে, কর্তার কর্মস্থল। রাতের সফর। রেলের কামরায় বাজে বসে আছে কোমরে কুকরি এঁটে, স্যুটকেসের ওপর থাকে পা।

—হুসিয়ার, বাজে, হুসিয়ার, ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। গাড়িতে চোখ বুজলে কি মাল খোয়ালে।

সাবধানী পেয়ে বাজে, কুকরি চেপে নড়েসড়ে সামলে বসে। ভাবটা যেন—তার মাল কাড়বে চোর, দেখা পেলে হয়। দেওয়ানজি, হাজার হলেও কায়েৎ তো, বাজেকে উস্কে দিয়ে, কোণ ঘেঁসে লাগাল ঘুম।

জংসন স্টেশন এটা, গাড়ি ধরবে, রাতও শেষ হয়ে এল।

কামরার দোরে কর্তার হাঁক—এ বাজে। শুনে, চম্‌কে উঠে 'হজৌর' বলে বাজে চোখ মেলল। কুকরি কোমরে বাজে বসেই ছিল, পায়ের নিচে স্যুটকেসটা, কখন, কে জানে, নিয়ে সরে পড়েছে।

ভোর হচ্ছে, গাড়ি বদলে অন্য গাড়ি ধরতে হবে।

ওয়েটিংরুমে খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে কর্তা শহর দেখতে বেরিয়েছেন। গাড়ির সময় হলে, ফিরে এসে দেখেন প্লাটফরমময় ফ্লাস্কের ভাঙ্গা কাচ আর খাবার গড়াগড়ি যায়।

মাস্টার বলে—আপনার লোক ছুটি আচ্ছা আহাম্মক তো, যা একটা কাণ্ড বাঁধিয়েছিল। জমাদার ধরে না ফেললে নির্ঘাৎ গাড়ি-কাটা পড়ে মরতো। কর্টনিয়ার গাড়ি স্টেশনে ঢুকতেই আয়ো, আয়ো—এসেছে এসেছে চিৎকার। হৈ হৈ করে গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে, চল্‌তি গাড়িতে উঠতে চায়। বিছানাপত্তর স্যুটকেস, কোন্‌টা কোথায় পড়ল, ফ্লাস্ক ভাঙলো; টিফিন কেরিয়ার খুলে খাবার মাটিতে ছড়ায়, খেয়াল নেই। ভাবুন অবস্থাটা।

বাজে জানায়—গাড়ি এসে গেল, চলে যায় যদি, ধরতে ছুটি।

বিছানা বাঁধার 'গুন্টাঝিটিকস্নে' সময় ছিল নাকি?

কর্তা বলেন—তাই তো, আমাকে ফেলেই যাচ্ছিলে, দেখছি।

ওহো হো, বটে বটে, কাজটা ঠিক হয় নি—বাজের বুদ্ধি ঘটে ফিরে এসেছে। যা 'হতার' হুড়মুড় করে এল, ভেবে দেখবার অবসর দিলে নাকি?

কর্তার অসুখ, দুরাত্রি ঘুম নেই।

আজ একটু ঘুমিয়েছেন। মাঝ রাতে পাশের কোয়ার্টারে বিকট চিৎকার হৈ হল্লা, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাজেকে পাঠালেন—চেল্লা-চিল্লি থামিয়ে এস, আমার ঘুম হচ্ছে না।

বাজে গিয়ে—ন করা ন করা মরাহো—বলে, চিৎকার থামলে তো? করবে কি বল? দেওয়ানজির বৌকে ভূতে পেয়েছে। ওঝা ধামী মিলে বৈঠ কী চালায়, দেবী ভর করে ভূত খেদাবেন। বন্ধ কর বললেই, বন্ধ হয় কি? দেখ দেবতাকে হেনেস্তা, বাপরে!

লোকের আস্করা পেয়ে, ধামী জাঁকিয়ে জিকির ছাড়ে।

—বটেট, চুপ করবি নে, চল হাকিমের কাছে। ভিড় ঠেলে বাজে ওঝাকেই ধরতে এসেছে।

বেগতিক দেখে ওঝা, দে ছুট, আঁধারে যায় মিলিয়ে। বলাবলি করছে সব—মিছিমিছি চেল্লাচিল্লি লাগিয়েছিল, দেবী ভর করে নি মোটে।

ত্রিণ ধাম তীর্থযাত্রা অবশ্য কর্তব্য পাহাড়ীর, বাজে সঙ্গী সাথী পেয়ে এবার তীর্থে বেরিয়ে পড়ে। ডোকোঝুরি সঙ্গে আছে। ডাল চাল, ঢেঁরো পিঠো, ইস্তক কাঠ কুটো, ছোট ভাঁড়ে ঘী রয়েছে। ঘী ছাড়া অন্ন, সে তো অশুদ্ধ অস্পৃশ্য। জাত বাঁচিয়ে রেলে মোটরে যায়, রান্না করে খায়, অন্যের ছোঁয়া খাবে না। ঢেঁরোটাই বেশী চলে। পিঠো মকাইর গুঁড়ো গরম জলে ফেলে ঘেঁটে কাই বানালেই হয় ঢেঁরো। কালোরং-এর ঝোলের সঙ্গে দলা দলা গলায় ফেলে দাও, মিঠো

চমৎকার। বেনারস হয়ে অযোধ্যায় এসে ঠাকুর দর্শন হোল, সরযুতে পিণ্ডি ভাসিয়েছে। শহর ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গা পেয়ে, অশখতলায় চুলো খুঁড়ে রান্নার জোগাড় চলে।

দুপুর বেলা। এক বুড়ো গরুকে তাড়িয়ে এনে, গাছের গোড়ায় বেঁধে দুই মুসলমান বিশ্রাম করতে লাগল।

—আহা, বুড়ো গরুটাকে টানা হ্যাঁচড়া করে কষ্ট দিচ্ছ কেন, বল তো—বাজে শুধায় তাদের।

—কিনে নিয়ে যাচ্ছি, হালাল করব। এই রদ্দ রে হয়রান করে মারল, চলতেই চায় না।

আরে রাম রাম, হোল কি! গরু কাটবে নাকি, পাপী মুসল্‌টেরা কী কয়?

—করব কি তবে? পয়সা দিয়ে কিনেছি, অমনি তো দেয় নি কেউ।

—রাম রাম, ও কথা বলো না। দাম আমরা দিচ্ছি, গরু ছেড়ে দাও।

—তোদের মাথা ব্যথা কিসের শুনি? ছেড়ে দাও বললে, আর অমনি আমাদের রুজী ছেড়ে দিলাম আর কি?

বাজে, বাজের সাথীরা অনেক বোঝালো, শোনালো, কাকুতি মিনতি হোল। শোনে না, মোছলমানের পো তো।

—তবে রে, ভাই সব, দেখচো কী? আমরা থাকতে গোমাতার দুর্গতি হতে দেবো না। যা, নিয়ে যা, দেখি, কেমন নিয়ে যাস্— কুকরি বাগিয়ে রুখে দাঁড়ায় সব। মোছলমানেরা প্রাণ নিয়ে পালাল, ছাড়া পেয়ে গরু ঘরমুখো হয়েছে।

খুশি মনে ভাত রান্না করে খেয়ে, সরঞ্জাম গুছিয়ে ডোকোতে ভরেছে। চলে যাবার মুখে মুসলমানের সঙ্গে পুলিস এসে ওদের ধরে নিয়ে থানায় হাজির করে দিল। যথার্থ কথা বললে তারা আদালত মানে না। অপরের সম্পত্তি ডর ত্রাস দেখিয়ে ছিনিয়ে নেবার অপরাধে

ছ'মাসের কয়েদ হতে বাজে বলে সাথীদের—দেখ, গাই মেরে হত্যো অপরাধ হয় না এদের। ধর্ম নাই, এমন দেশেও মানুষ থাকে!
ছুটি নিয়ে বাজে পাহাড়ে যাচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত করবে। পাপ কথা কানে গেল, কর্ণ প্রাচিত্তির দরকার তার।

পাখীর রাজত্ব এই পশ্চিম নেপাল। বাজ, চাখুরা, ডাফে, মোহলাল ময়না টিয়ে, চন্দনা ময়ূর সারস ঘুঘু, দোয়েল শ্যামা লালমুনিয়া ভৃঙ্গরাজ তিতিরবটের—পাখী কিনবে তো যাও গোলামণ্ডি।
নয়ামুলুক, যে প্রান্তটা জঙ্গবাহাদুর বিদ্রোহী সেপাইদের সাহায্য না করে, ইংরেজকে বাঁচায় বলে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে পেয়েছিলেন। দেখবে, কত রাজা উজির এসেছে জঙ্গলের পাশে সেই বাজারে। জুমলিরা আনে—কস্তুরি কুকুর, কম্বল চামর আর শাহীবাজ জুরিবাজ! দাম জানো তো? তালেম পাওয়া শাহীবাজ একটা পাঁচশো টাকা, জুরি দেড়শো দু'শো। হায় রে বাদশা আমল! যা করেছ, চরমই করেছ, তোমার আমার ও-সব অনধিকার চর্চা। শাহী সহজে মেলে না।
এ কী কাক চিল, ভাত ছড়ালেই আসবে? পাখির রাজা থাকে নির্জন প্রদেশে, হিমালয়ের ধ্বসনামা পাহাড়ের গায়ে উঁচুতে গর্তে বাসা করে। গাছে বাঁধে পাহাড়ী লতা, এ মুড়ো কোমরে জড়িয়ে খাড়া ধ্বসের গায়ে ঝোলে, জুমলি পেণ্ডুলমের মত দুল্‌ছে, নিচে তলা ঠাহর হয় না। মাকড়সার চালে এগিয়ে, গর্তের পর গর্ত খুঁজে বাজের বাচ্ছা কোমরে বাঁধা ঝুড়িতে তুলবে, বাজের ঠোক্কর ঝাপড়ে গ্রাহ্য নেই। যা পেল, নিয়ে আবার লতা ধরে চূড়োয় উঠছে গিয়ে। বাজ নিয়ে পাখি শিকার, যেমন পোষা চিতের হরিণ-ধরা। যা নখ, মাংস খুব্‌লে নেয়। কব্জিতে বাঁধা দস্তানা, তারপর পোষা বাজ বসবে, চোখে চামড়ার ঠুলি। এ দৃশ্য মোঘল যুগের রাজা বাদশার ছবিতে দেখে

নিও। ঠুলি সরিয়ে পাখিটা দেখিয়ে দিলে, বাস্, চক্ষের নিমেষে বাজ তীরবেগে উড়ে, পাখি নিয়ে হাতে এসে বসবে। এতো আর দুধ-ছোলা খাওয়া পাখি নয়, নিত্য মাংস চাই, বড়লোকেরই পোষায়।
তিতির বটের চাখুরা, ওস্তাদ লড়িয়ে। একবার সাম্না সাম্নি করো দিকিনি, পালোয়ানের দাও-প্যাঁচ শুরু করে দিল। এদিক ও দিক ঘুরবে ফিরবে, মৌকা বুঝে জুড়ির বুকে দু'ঘা লাথি জমিয়ে এসেছে। বেশ অনেকক্ষণ লড়াই করে, যেটা হারলো, দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। মালিকেরা এরপর বাজি রাখে, হারে জেতে। পাখির তেজ বাড়াবে, তাকে কস্তুরি, মাংসের কলিজা খাওয়ায়। আপাদমস্তক ঢাকা খাঁচায় করে হাতে নিয়ে বেড়ায়, হয়রানি কম নয়।
ভৃঙ্গরাজ দোয়েল শ্যামা বড় মিষ্টি করে শিষ দিচ্ছে। এতেই ওদের ভারি কদর, সুন্দর খাঁচায় বসে দানা খায়। রূপে মোহিত করবে ময়ুর, আর লালমুনিয়া তো উড়ে উড়ে ঘুরে ফিরে রূপ ছড়ায়। ডাফে মোহলাল রূপসায়রে সদ্য স্নান সেরেই এসে বসল। দুটো সারস এলে বাগানে ছেড়ে দিও। দেখো, বাগানের ভোল ফিরেছে। বাগান বললাম, তাই কি ঝিঙ্গে-মূলোর বাগানে মানায়, উদ্যান চাই। পাখী নিয়ে একবার পাহাড়ীদের ডেরায় যেও।
কত কি এনেছে তারা। কত সুগন্ধি লতাপাতা, কত ওষধিগুল্মমূল, ওষুধ হবে, গন্ধ চোঁয়াবে। বংশলোচন শিলাজিৎ, ভালুকের পিত্ত বিরোজা, তিমুর চিরেতা, তেজপাতা পিপুল, লোধ যষ্ঠিমধু। মঞ্জিষ্ঠা মিঠাবিষ, শতমূল অনন্তমূল, ভৃঙ্গরাজ সালবমিশ্রি, পঞ্চাঙ্গুলিয় বুধনাঝাউ, পদমছাল বাঁদরলাঠি দেবে তারা। মালা বানাবে আর কানে ঝোলাবে তো, রং বেরংয়ের পাথর আছে। স্ফটিক হকিব গোদন্ত ক্যাটস্আই, কাল সবুজ নীল লাল, দেখো, বেশ লাগছে। কস্তুরি কিনতে যেয়ো না যেন, ডাহা ফাঁকিতে পড়বে। অর্থনাশ মনস্তাপ কেউ ঠেকাতে পারে না, পাহাড়ী নির্ঘাৎ নকল কস্তুরি গছিয়ে দেয়।

মহামূল্য বস্তু কস্তুরি সহজে মেলে নাকি? মৃগনাভি পরিপক্ক হলে, কস্তুরি মৃগ গন্ধে অস্থির, পাথরে ঘসে সেটা ত্যাগ করে, হিমালয়ের কোন্ তুষার শৃঙ্গে, কে জানে। এ মৃগমদ দুর্লভ বস্তু, যার একমাত্রায় অচল হারানো নাড়ি সচল হয়, মুমূর্ষুকে সতেজ করে। কস্তুরির থলে 'বিনা', তাতে রক্ত পুরে গন্ধ দিয়ে পাহাড়ী আনাড়ি ঠকায়। জমাট রক্তের দানার মত কস্তুরির দানা, তফাৎ ধরা শক্ত ব্যাপার, অভিজ্ঞ-রাই পারে।

যেথায় জন্মায় জনকনন্দিনী জানকী, এ দেশেব মেয়ে মৈত্রেয়ী গার্গী বেদের পাতে দিল সুক্তো। লুম্বিনির বনে জন্মে শাক্যসিংহ তুলে ধরে অহিংস নিশান। পাহাড়ী ছেলে বাঘ সিং চূড়োয় চড়ে কিনেছে জগৎ জোড়া নাম। নেপালী তার হেঁড়ে গলায় গান গায়—হাম্রো তেনসিং শেরপালে চড়েহো হিমাল চুচুড়ো—তেন্ মানে বাঘ যে। পাহাড়ে সমতলে সুন্দর দেশ নেপাল, ধনধান্যে ভরপুর। সুখে শান্তিতে লোক আছে ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে। দেখা দিল অনাবৃষ্টি, পর পর তিনবছর জলের দেখা নেই, একদানা শস্য হোল না। হাজারে হাজারে লোক অনাহারে মরে, রাজা প্রমাদ গণলেন। দৈবিক লৌকিক অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই, দেবতা অপ্রসন্ন।

রাজা বলেন—মন্ত্রী এখন কি করি?

মন্ত্রী যুক্তি দেয়—মহারাজ, দৈববলই মহাবল। আমার গুরু সিদ্ধ-পুরুষ, থাকেন বারানসী। আজ্ঞা হলে, আমি গিয়ে তাঁকে ধরে, যদি কিছু হয় উপায় করতে পারি।

মন্ত্রী চলেছে বারানসী, পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে গুরু আনতে। মহা-পুরুষ এনে বরুণ জপ করলেন হপ্তাবধি, রুদ্ধদ্বারের আড়ালে এক-নাগাড়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিবর্জিত হয়ে। দেবতার কৃপায় শুরু হোল প্রবল বর্ষা, দেশ হেসে উঠেছে।

রাজা বলেন—মন্ত্রী, একে তো ছাড়া যায় না।

সাধ্য সাধনায় রাজি করে, বাংলা থেকে কন্যে এনে বিয়ে দিয়ে, সংসারী করে রেখে দিলেন সেই সংসারত্যাগী যোগীকে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেশে তাঁর জন্য স্থাপিতা হন ভবানী, পূজার্চনায় প্রচুর ভূসম্পত্তি হয় বরাদ্দ। সিদ্ধযোগী গণেশ ভট্টাচার্যের বংশধরেরা সে সম্পত্তি পাঁচশো বছর ভোগ করে এসেছে। ভবানী ভাতগাঁয় প্রতিষ্ঠিতা।

মেয়ে বিয়ের দায়, উকিলপুত্র বাগাব। উকিলবাবুর সগোত্র এম, এ, বি-এল-এর দোরে হানা দিয়েছে, পরিচয়-পত্রের জোরে। রং ফরসা ভদ্রলোক আলাপ করেন, দাড়ি কাটতে কাটতে।

নেপাল থেকে এসেছেন, সেখানেই বাস, বলেন কি ? সে দেশে তো আইন নেই, রাজার হুকুমই কানুন, যা বলেন তাই হয়। নিবেদন করি—ওঁরা বলে দিলেন, উকিলের সঙ্গে দেখা করতে। এক উজবকের সাক্ষাৎ পাব, জানা ছিল না।

সাদামুখ গোলাবী হোল—একথার তাৎপর্য ?

আজ্ঞে, গুটি দুই সওয়াল এসে যাচ্ছে, গোস্তাকি মাপ হয়। ডিউক অব ডিভনসায়ারের নানী কোন্ ডাঁটাচচ্চড়ি খান, পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা আছে। জানা নেই শুধু, দুনিয়ার একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য আপনার দোরগোড়ায় আবহমানকাল দাঁড়িয়ে। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে। নেপালের আয়তন, লোকসংখ্যা কিছু জানা নেই তো ? তবে বলি, পাঁচশো মাইল লম্বা, গড়ে একশো মাইল চওড়া রাজ্য, প্রায় কোটি লোকের বাস। রামার গরু শ্যামা কেড়ে নিল, মধুর কড়ি যদু লোপাট করেছে। রাজা দেশময় ছোটাছুটি করে হকের ধন যোদো-সেধোকে দিয়েই বেড়াচ্ছেন, এ বুদ্ধি বারণের বাড়া। কাটামুণ্ডু চল। না বাবা, ও মুখো নয়, চ্যাপ্টা নাক থ্যাবড়ামুখো গুর্খা ভুজালি উঁচিয়েই আছে। খাচ্ছ দাচ্ছ সুখে আছ, কেন মিছে বাহাদুরি

ফলাতে পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াবে ?

অরে বাপু শোনো, কাটামুণ্ডু নয়, কাঠমাড়ৌ মানে কাষ্ঠমণ্ডপ। একটা গাছের কাঠ নিয়ে মস্ত মণ্ডপ হয়েছে, সুবাদে কাষ্ঠমণ্ডপ-কাঠমাড়ৌঁ। জিবের জড়তায় পেঁয়াজ রসুনের ফোড়নে ওটা ভয়াবহ [illegible]ায়, আঁৎকে ওঠবার কিছু নেই। রানার কড়া শাসন, মাল ফেলে তান্‌জামে চড়ে পাহাড় পাড়ি দাও। দুদিন হোক, তিনদিন হোক, মাল নিয়ে কুলি তোমার দোরে হাজির, তছরূপ হবে না। আর ভয় খাবারই বা হয়েছে কি ? মেয়ের বিয়ে দিতে আসেনি অশোক প্রিয়দর্শী, তোমাদের ভারতের হিন্দোস্তান হামারার একচ্ছত্র সম্রাট, নেপালে ? তার বিটি ললিতে বসালো ললিত পত্তন নেপালের রাজধানী পাটন। পরে না হয় রাজওয়াড়া হয়েছে, কান্তিপুর কাঠমাড়ৌঁ। গৌড়ে বল্লাল জলাশয় খোঁড়ে, কুলীনকন্যের চোখের জলের আধার, মহীপাল দীঘি আছে দিনাজপুরে। অহম্‌কে অসমে তাড়ায়, বল, কোন্ সে বঙ্গীয় দেব ? বাংলার রাজা নেপালে রাজত্ব করেছে তিনবংশ—সেন দেব পাল।

ভাষা বোঝ না, তাতে কি আর এমন এসে যাচ্ছে ? পাঁড়ে কর্নেল ডিম খায়নি বিলেতে ? দোটেলের ভাষা জুমলি জানে নাকি, সল্যেনীর কথা পালপালী ? লিম্বুয়ানে সাম্‌লে চলে কিরাতী। বলতে কি, বুঝবে কী, সোজা চালিয়ে বসে ভুজালি। ভাবলো বুঝিবা ইয়ার্কি দিতেই এসেছে। অবগুণ্ঠন নেই, লেহেঙ্গা ঘাঘরায় তরঙ্গ তুলে, কুকরি কোমরে কলাবৌ শ্বশুরবাড়ি এল। মরমিয়া পাপিয়া তারে আপন করে ডাকবে কি না ? লেপ্‌চার খ্যাপ্‌চা খাপ্‌চা কথা—ধোর্জলং খার্সাং—দার্জিলিং কর্সিয়াংকে বলা, বোঝে নাকি ঝাপার রাজবংশী বাঙালী ? সদরেই দেখ না, গোর্খালী গুরং, নেবার তমাং যে যার বুলি ঝাড়ছে নির্বিবাদে কে কার কড়ি ধারে। পাখীর কথায় মুখে কোকরকোঁ, হাতে বক দেখাতে জানো ? জানো নাকি পাঁঠার

বেলায় ভ্যাঁ করতে ? মণ্ডির দেশোয়ালী বেনে বিদ্যেবিশারদ, পাহাড়ী পটিয়ে ফলাও কারবার করে বসে, হাত নেড়ে চোখ নাচিয়ে কেল্লা ফতে।

পাহাড়ী ঘীনারাংগী, কম্বল পিপুল, আলু তেজপাত নিয়ে হটেরু ঢাক্রেরা ঝরতে লাগল, নেমে এল চট্টানে, দলে দলে। আগু বে[redacted] বেনে, দলপতি মুখিয়ার হাতে ধরায় চুরোট, মাথায় জড়ালো পাগড়ি। ইসারায় ইঙ্গিতে বশ করে, উঠিয়েছে এনে নিজের অন্দরে, সুলক্ষণা কন্যে, সুচতুরা বেনেবৌ তদ্বির তদারকে ব্যস্ত। মুখমণ্ডলে মুচ্কি হাসি, বিলোল কটাক্ষ অপাঙ্গে, অপোগণ্ডদের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছে, বাক্য নিষ্প্রয়োজন যথা। আদর আপ্যায়ন ভোজন বিশ্রাম অন্তে হবে ব্যবসাদারি।

মণ সের ছটাক পোয়া চলে না যে পাহাড়ে, দর হবে 'কণ্টরে'। ঘী বিক্রি হয় একটা টিন ধরে, রফা হোল দু'পঁচিশে। গরমিলে হরে দরে বেশ কম হতে থাকবে অন্যান্য টিনে, এতে আর কার কি বলার আছে, কথা পাকা।

দাঁড়িপাল্লায় উঠেছে নিরিখের টিন। এই ত্যাখো! ঝাঁ চকচকে বণিক-দুহিতা উদিতা অকুস্থানে। অপূর্ব এ আবির্ভাব! অবাক পারবতীয়া আঁখি আটকে গেছে সে দৃশ্যে। যেমনটি হোল মেঘোদয়ে দেবদেউলে নাচুনিদের, কালীদাসের কালে।

তুলাদণ্ডে ঝুলছে ঘী, সিদ্ধ হস্ত বেনিয়ার, অবহেলে গেল গলে ফাল চতুষ্টয় টিনের পেটে। হাতের ইসারায় কাজ সারে লখাই, কথা-কোবিদ্ করবে কি ?

পাহাড় পথে রাজধানীর রাস্তায় ভিক্ষাখোরি, অবস্থানকে সার্থক করে দেওয়া নাম। নিচে চার ক্রোশের ঝারি ভয়ানক বন, বনে জল নেই, নিপনিয়া। বাঘ ভাল্লুকে ভরা। উত্তরে চূড়ে, বালি পাথরে উষর

পাহাড়, কাজেই ভিক্ষাই ভরসা।

নেপালে দাসত্ব মোচন করেন মহারাজ চন্দ্র সম্‌সের। 'কামারা কামারি' কড়ি দিয়ে কিনো, 'অমলেখ' কিনা গচ্ছ-ইচ্ছ-যথা-সুখম্ করে ছাড়েন। তাদের 'বাস গাঁস' অর্থে, ভাত কাপড়ের স্বার্থে, গাছ কাটা। জোত জমি পেল, হেলে এঁড়ে দরুণ কাঁচা পয়সা জনে জনে গছিয়ে বলেন—ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। তোদের ধরা ভিক্ষাখোরি হয়ে থাক অমলেখগঞ্জ, হরষে ধরসে লাঙ্গলের মুঠি।

খাঁচার পাখী, খোলা আকাশকে ডরায় খুব। মাটি খুঁড়ে খাওয়া যার তার কম্মো নয়। বিশেষতঃ, বন কেটে বসত, অশত্থের অভিশাপ কালাজ্বরে তাড়া দিতেই অমলেখরা যে যার কুলায় ফিরে গেছে। সরকারের অর্থনাশ, ভিক্ষাখোরির সমূহ লাভ, অমলেখগঞ্জ নামটি রয়ে গেল, ঐতিহাসিক যুগ সন্ধিব সাক্ষ্য। তদবধি কন্যে চুরি ঘোরতর অপরাধ, ক্রেতা বিক্রেতার দণ্ড বাহাল হয় সাত বছরের সশ্রম কারাবাস। তথাপি লাভজনক ব্যবসা, ঘবানালোকেবা লিপ্ত আছেন। দ্ররবারে কেটির প্রয়োজনে এনে, ডজন দরে 'ডোলা' অর্থাৎ সুন্দরীর পসরা সাজিয়ে নিয়ে সপরিবার কাশী রওনা হবেন। কারবারীরা পথ চেয়ে বসে আছে, দালাল ধরে দর দস্তুর হয়। রেট্, মাল বুঝে হাজার দেড় হাজার।

কন্যের বাড়বাড়ন্ত, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দেশে। কোশল মগধ গান্ধারে তুলনায় অনুপাত বড়ই কম, কাজেই প্রত্যন্তদেশে পরিবারের খোঁজ পড়ে। নেপালে তখন, যখন তখন প্রবেশ নিষেধ ছিল, শুধু শিবরাত্রিতে সাত দিন দোর খোলা। সেই সুযোগে পশ্চিমেরা ভিড় করে, সস্তায় কিনে, কলজের ধনকে কৌশলে ফাঁড়ি এড়িয়ে ঘরে নিয়ে তুলবে। এ হাটেও বেচা কেনা চলে মন্দ না। পাহাড়ী প্রচুর সওদা আনে, বাছাই করলে ভাল মালও পেতে পার। লোভনীয় লালিমা, স্বভাব

কোমল অতি, সম্ভবত অভাবের চাপেই। ছাপড়ার সরযুপাড়ি টিকাধারী তিবারির অনন্য প্রয়োজনে পশুপতি আসা।

দরকসর দেড় হাজারে এক রূপের ডালি ধরে, ভিতরে আড়ালে আনন্দে ঘরে ফিরে গেল। কৃত্রিম বাপ, পরিচয়ে নৈষ্ঠিক নৈকষ্য গৌড় বামুন, কাজেই কন্যের মঙ্গলাচরণ হয়ে বরের ঘরে স্থায়ী হতে বাধে না।

কা কহ তাট—ঝটপট পাক্কিবোলি বুঝতে নারে, দম আটকায়। কালে তা সেরেও যেত, কিন্তু গোল বাঁধালো বিড়ি। বিপ্রের ঘরে বারণ, এদিকে কন্যের না টানলে পেট ফোলে। তিন দিন পর কানের মাকড়ি খুলে ঝিয়ের মেয়ের হাতে দিয়ে, এক বাণ্ডিল আনিয়ে নিল। অন্ধকার নিভৃত ঘরের কোণে বসে একটার পর একটা ফুঁকে চলেছে, অবদমিত ক্ষুধার খোরাক। গন্ধে দিগ্দেশ আমোদিত হতেই শ্বাশুড়ি ধরে ফেলে—অরে লখনা, এ কোন্ মুচি মুদ্দফরাসের বেটি ধরে নিয়ে এলি। বামুনের ঘরে একি অনাচার, ঝেঁটিয়ে দূর কর।

কথায় কাজে এক হতে, আঁধারে বধূ মিলায়। বিরহীর সকল প্রয়াস বিফল করে নজর বাঁচিয়ে কল্যাণী ঘরে ফিরে গেছে। হা হতোস্মি! হারাল মাথার রতন। কষ্টার্জিত মুঠো মুঠো টাকা বুঝি জলে যায়, পুনরায় পশুপতি মেলায় তাকে খুঁজতেই এসেছে। পেয়েও যায় ঠিক। পাহাড় প্রান্তে অমলেখগঞ্জের 'দমাই' দোকানে, ঐ সে, সেলাই কলে বসে।

—অ আমার নয়নমণি! তোমা বিহনে আমি দেখ, মণিহারা ফণি, পরাণের বড়ি ধনি, ঘরে ফিরে চল—হাম্‌ড়ে ধরে।

বৌ ধরে কে—দর্জি ব্যাটা কাছে পিঠেই ছিল। সবলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ঝটাপটি আরম্ভ। তা থেকেই পুলিস, দুটোকেই থানায় নিয়ে গেছে। ব্যাপারটা আদালতে গড়ায়। গৌড়ের কন্যে চুরির দায়ে কারাবাসের সবে শুরু। ভরসায় আছি—বিরহী যক্ষের আর একদফা

অবিনশ্বর কাব্য বেরুল আর কি।

অনুরূপ বেসাতী রাজকুমারী মৈয়া, কলকাতার হিরালাল অগরবালার চোদ্দশোতে বেনারেস থেকে কেনা। অনর্থ বোধে খর্কবাহাদুর খড়্গাঘাতে হিরেকে বধ করে। এখন মৈয়ার কি হবে উপায় ?

হায় খর্কবাহাদুর ! জানি না তোমার দৌড় কতদূর। একবার খোদার হুজুরে দরবার করে দেখতে। প্রাচীতে পরিমাণ মত দিয়ে কন্যে, প্রতিচীতে বেশী চালান দিতে রাজি হন কিনা—তদ্‌বীরে কি না হয়। এদিকে জনকে চারজন গছিয়েও বহু অনূঢ়া থেকে যাচ্ছে, তারপর দারিদ্র্য তো রইলই। লালবাতির গলি নেপালে নেই। সরকার নাম রেজেস্ট্রি করে টু-পাইস কামাতেও জানে না। তা হোলে না হয়, ব্যারাকে ধরে ব্যবসা চালানো যেত। পণ্যস্ত্রী বসন্ত সেনার। সমাজ যন্ত্রে সেফ্‌টিভ্যাল্‌ভ, সে বোধ হবে কবে ?

শ্রাবণে ঘণ্টাকর্ণ খেদানো, পাল পার্বনের অন্ত নেই নেপালে।

দক্ষিণ একদম সীল-করা, নেপাল উপত্যকায় যত উৎপাত উত্তর থেকে দুষ্টু দানব, তির্বতী ভুটিয়াই হবে, উড়ে এসে জুড়ে বসে। ছ'ফুটি সব, বড় কষ্টে হটিয়েছে রাক্ষসদের। আজ্‌ও চৌমাথার মোড়ে, নল-খাগড়ার ঘণ্টাকর্ণ খাড়া করে, পথচারীর কাছে পয়সা চায়। 'জগাৎ' বলে কুলো বাজিয়ে, ঠ্যাং ধরে হেঁচড়ে টেনে ফেলে আসে নগর বাহিরে মাথট্ তুলে, পয়সা করে, ঘণ্টাকর্ণ লড়াইয়ে খরচ জুটেছে। মনে দাগা আজও মেটে নি।

আশ্বিনে পিতৃপক্ষ। বাপ দাদাদের ডেকে অন্ন দিয়েছে, মা দুগ্‌গাকে ডেকে দিল পাঁঠা মোষ, দেবীপক্ষে।

মোষ্‌টাই বাঁধালো বিপদ, খাস মহিষাসুরের বাচ্ছা। সুরারঞ্জিত ভাঁটার মত চোখ, মুখে ফেনা ছাড়ে, নাকে ফোঁস্‌ফোঁসানি, ধোঁয়া বুঝি। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তীক্ষ্ণ শিং গুঁজে তেড়ে এল।

'ভক্ত', মা দুগ্গার মূর্তি, রাতে মহাকালী। বিরাট রাঙ্গা মুখোস চড়িয়ে, খাঁড়া নিয়ে তাড়া করেছে, রঙ্গীন ঘাঘরা হাওয়ায় ওড়ে। বসিয়ে দিল এক ঘা। মোষ তো, একগুঁয়ে, রেগেমেগে তেড়েফুঁড়ে ঘুরে ফিরে তুমুল কাণ্ড করতে লেগেছে। তাড়া করবে তো খাঁড়ার ঘা। ভক্ত পাক মারে, শিংয়ের খোঁচা সামলায়, যা রেগে আছে লোকগুলো 'হো হো' করে সিটি মারে, ক্যা মজা! শিঙ্গে ফুকলো 'হুট্ হুট্', ঝকাঝক কাঁসর পেটে। অসুর মারা খাঁড়া ধরা কালী মাইকী জয়—বেজে চলে জয়ঢাক জগঝম্প। রাত দুপুরে ঘাঘরা ছড়িয়ে ভক্ত নেচে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কালো মোষটাকে বধ করেছে, অসুরের বারোটা বাজল।

'গাইযাত্রা'য় গাই সাজবে। এ বছর যার ঘরে কেউ মরেছে, তার ঘর থেকে গাইযাত্রার সঙ বেরোয়, মাথায় কাগজের শিং মুকুট। হলুদে ছোপানো ধুতি উড়ুনি, ইয়া গোঁফ নিয়ে সঙ্গে ঝোলা কাঁধে এক যোগী। রাস্তায় ঘুরে প্রেতাত্মার মুক্তির পথ করে দেয়। কুকুর কাক গরু, কেউ বাদ যাবে না। সাজাবে রং দিয়ে, খেতে দিল উপাদেয় ভোজ্য, যার যা। পাড়ায় পাড়ায় রকমারি সঙ, হাটে হাঁড়ি ভাঙে। হও না রাজা, হলেই বা রাজপুরুষ সাউকার মহাজন, কুকীর্তির নকল করবে। গাইযাত্রায় সাত্‌খুন মাপ, সঙ সেজে ভেংচায়, গিল্লা করবে। রেয়াৎ করে না, কোথায় লুকোবে বল, হুসিয়ার।

হা কলা, হা কলা—মুখ ঢেকে ডুকরে কাঁদে য়েমি শহুরে নেবার। ছেলেবেলায় কন্যের বেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, জন্ম এয়োতি। এখন যে ঘরই ছাড়ুক, পতি-বিয়োগ হচ্ছে না তার, ভাবনা কি? বিচ্ছেদ অতীব সরল। রাত গহীনে উপাধানতলে গোটা সুপুরি রেখে চলে গেল সীমন্তিনী। নিশি ভোরে, চিহ্ন দেখে বিষয় হৃদয়ঙ্গম হতে—হা কলা, হায় বধূ—বলে কেঁদে ভাসায় পতি।

তুমি মোর জীবনে আসিও ফিরে—সাত ঘর ঘুরে আবার এসে যদি উদয় হয় কলা, তবে তো পরম সৌভাগ্য। লক্ষ্মীছাড়ার ভগ্ননীড় হেসে উঠল, ঠাকরুণ পাটে বসেছে, আদর উথলে পড়ে।

[redacted]মাণ্ডুর বর্দ্ধিষ্ণু সমাজ, নেবার সমাজ। পুরাকালে দাক্ষিণাত্য হতে ব্যবসাসূত্রে এসে থাকবে নেপালে। সুশ্রী চেহারা তীক্ষ্ণ নাসা বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, এরাই বিদ্যা বুদ্ধি বাণিজ্যে অগ্রণী, বড় বড় পদ অলঙ্কৃত করেছে। বৌদ্ধ ছিল, হিন্দু হোল তবু সামাজিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়, মোষ খাবে আবার ছাগবলীও দেয়। কালীর রক্ত তিলক কপালে, গলায় মৎসেন্দ্রনাথের চির, ঘুরে বেড়ায় সাউ, মদ্য মাংস প্রিয় খাদ্য। শহরগুলিতে ব্যবসার খাতিরে আছে সব, পাহাড়ে এদের বড় একটা পাবে না।

নেবারবস্তির গলি পেরোনো মানে নরক মাড়ানো, সন্তর্পণে পাশ ঘেঁষে চলে পাহাড়ী। দোতলার গবাক্ষতলে উৎসারিত জলে নিসিক্ত হোল তার দউরাসুরবাল কোমরবন্ধ টুপি।

চোখ্ তুলে জিজ্ঞাসা পাঠায়—চোখো—শুদ্ধ জল তো ?

গলাবাড়িয়ে জানালো নেবার —চোখ—সুত্রই বটে।

ওই চাপান উতোর ভেসে আসে সান্ধ্যবায়। মেলার ময়দানে হট্টগোল থেমেছে, ঘরে ফিরে গেছে যাত্রী। যোগ বুঝে রমাইলো মানাতে পর্বত কন্দর বেয়ে নেমে এলো আনন্দের পূজারীরা তীর্থে। দিনভর মেলায় মজা লুটছে। সাঁঝের লগনে দুদলে ভাগ হয়ে, দুদিকে জমায়েত হয়—এদিকে কুমার, ওদিকে কুমারীরা—গানে গানে প্রশ্নোত্তর চলে, জোড়ায় জোড়ায় টুমটুমাটুম্ মাদলের বোল, সঙ্গে ঝাউরেগানের লহর, লয়ের দিকটা সুর টেনে যে যত লম্বা করতে পার। গিরিগাত্রে চোট খেয়ে ফিরে সুরের তরঙ্গ হিল্লোল গান গ্রামের পর গ্রামে উঠতে

লাগলো। যার যার দোহাররা ঝপাঝপ্ মাদল পিটে জোশ জোগান দিয়ে চলেছে, কথার চতুরালী চমক হানে।

শেষমেষ এসে গেল—বাক্ সরে না, উতোর জোগায় না, এমনি চাপান, প্রতিপক্ষ নির্জিত হোল। গুটি গুটি এসে হেঁটমুখে দাঁড়ি[redacted] বিজিত মাশুক বা বিজিতা মাশুকা। ফুলদলে সজ্জিতা মৃগনয়না সহেলি ব্রীড়াবনত মুখে, কিম্বা কানে ফুল, মাথায় টুপি, কালো চোগায় রূপোর বোতাম আঁটা, কুকরি কোমরে পিয়ারা। নাচে গানে মাদলের ঘায় উতল মুহূর্ত, ঊর্ধ্বে রাকা, নিচে ঝিল্লি গুঞ্জিত বনতল, দুটি পিয়াসী হৃদয়কে মিলন সুধা সিঞ্চিত করল সখি-সখা একযোগে। দয়িতের হাত ধরে দয়িতা, অথবা বিজয়িনীর বাহু বন্ধনে বল্লভ, হেসে খেলে চলে সংসারযাত্রা পথে। সমাজ মেনে নিল এ প্রজাপতির নির্বন্ধ ভোজভাতের মাধ্যমে, হয়ে গেল বিয়ে।

এই দেখছো, বীর যোদ্ধা গুর্খা সৈন্যের জনক জননী, দেশ বিদেশে নেপালের মান উঁচু করেছে যারা।

পাহাড় ঘরে জন্মালে যেমন তেমন, মরলে আর রক্ষে নেই। লামা গুণিরা এসে যাবে, 'ঘ্যাবা' হবে—জপ তপ তুকতাক্ করে আত্মার গতি নির্ণয়।

দেহটা তেল মাখিয়ে পট্টবস্ত্রে সাজাল, ধ্যান মুদ্রায় বসিয়েছে তাকে। ফুল দিল, ধুপ দীপ জ্বেলে দিয়েছে। মাসাবধি চলবে পূজারতি মন্ত্র পাঠ মদ্য মাংস অন্ন নিবেদন, প্রসাদ বিতরণ। ভয় নেই, পাহাড়ী হাওয়ায় দেহ তিন মাসেও পচে না, ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে।

এবার লামা ধরে ফেলেছে আত্মার গতি—কোথায়, কোন যোনিতে জন্ম হোল তার। দেহটার সেই মত সৎকার হবে। হয় আস্ত, ঐ ভাবেই পুঁতে ফেলা হোল, নয়তো টুকরো করে কেটেকুটে শেয়াল কুকুরের ভোগে লাগবে। অধঃপতিত আত্মারামের খাঁচার কে কদর করে, বল ?

আর নেবার যাচ্ছে, দেখ। কালো নিশেন ঝোলে, পিতলের লম্বা ভেঁপুটা টোঁ টুহুঁ করে থম্‌কে থম্‌কে, ডুগ্ ডুমাডুম্ ঢোলের বোল। থালার মত কাঁসার করতাল, ঝম্ ঝকঝক ঝম্‌ঝম্ বাজে থেকে থেকে। তারপর বাহকস্কন্ধে, ধুপ দীপ জ্বালা লাজাবীর ছড়ানো মূল্যবান [redacted]মের ওড়নায় গা মুখ ঢেকে, সটান্ পড়ে আছে মুর্দা। খাট ধীরে এগোয়, পশুপতি আর্যাঘাট কিম্বা শোভাভগবতী শ্মশান পানে। মাথায় কাপড়, ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে নেবারের শোকার্ত পরিজন। সবার পিছনে আসে, শিকেয় ঝোলানো কেলে হাঁড়ি আগুন নিয়ে। এর সৎকার করবে—মৃত সংস্কার গুঠি—গুষ্ঠি পিছু গুঠি, এ কাজ করে নিষ্ঠার সঙ্গে। কোন্ গোষ্ঠিপতি কবে বড়লোক হয়ে, ভূসম্পত্তি রেখে গেছে, গুষ্ঠির কাজ চলে তার আয় থেকে, ট্রাষ্টি গুঠির তদ্বিরে।

খাঁটি হিন্দু ঘরে পড়ে মরে না, মরে ঘাটে পড়ে। ডাক্তার বদ্যি শেষ সম্বল সুচিকাভরণ ছাড়তে নাড়ি ছেড়ে যায়, জবাব দিয়ে গেল—মুমুক্ষুকে পশুপতিশরণে চালান দেওয়া চলে।

মিয়ানা ডুলি কাঁধে হাজির আছে বামুনরা, তারাই বাহক।

এ বাবদে পুণ্যার্থীরা তীর্থে বাড়ি করে রেখেছে,* সে পুরীতে কারও তেরাত্রি বাস কারও বা একমাস। বেঁচে বর্তে সশরীরে ঘরে ফেরা ঘোর অনাচার, বিদেহ কৈবল্য পেয়ে গেলে অবশ্য তার কথা আলাদা।

সাহায্যার্থে তৈরী থাকে ঘাট বৈদ্যরা, অসুখ মোড় নিয়েছে কি তড়িঘড়ি যাত্রীকে আর্যাঘাটে নিয়ে এল। বাগমতির স্রোতে পা ডুবিয়ে, চিৎ করে ফেলে বুকে ঠাসে আঁজলা আঁজলায় জল, অন্তর্জলী প্রারম্ভে প্রাণপাখী পালাতে পথ পায় না। পণ্ডিতেরাও প্রস্তুত, ঝট্‌পট্ গরুর লেজ ধরে হেঁচড়ে টেনে বৈতরণী পার করে ছাড়ে—এখানে এসে ঘুঘু, নাগাল পেলাম না, আপ্‌খুশি উড়লে ভবপারে বোঝাপড়া করগে যাও—ফাঁদে পেয়েছে।

পাঁড়ে কর্নেল মৃত্যুশয্যায়, শেষ সময়ে আর্যাঘাটে অন্তর্জলী হোল। খবর আসে তার স্ত্রী সতী যাবে, জেদ ধরেছে। তাই কি হয়, আইনে যে মানা। রাজার কাছে জাহের হতে, রাজ পুরুষেরা নিষেধাজ্ঞা শোনায় তাকে। শুনে, গুম্ হয়ে, মৃত পতিকে আঁক্‌ড়ে ধরে, সেই যে চোখ বুজল, আর খোলে নি। চিতা সাজিয়ে দেখা যায়, তা[redacted] আত্মারাম খাঁচাছাড়া। কি বেয়াড়া মেয়ে বাবা! খসমের লগে আখের একচিতায় শুলো, তবে ছাড়ল!

আত্মশ্রাদ্ধের কথায় আসা যাক।

স্বর্গীয় রাজার ব্যবহারের যা কিছু, তা ঘরে রাখা চলে না। গাড়ি ঘোড়া মিয়ানা তঞ্জাম জুতোজামা গাড়ু গামছা ছড়িঘড়ি চশমা রুমাল, যেখানে যা, খুঁটে কুড়িয়ে পুরুতকে দিয়ে দিল। বাকী থাকে বাড়ি, ছত্রদণ্ড শিরতাজ গদি, ছেলে ধারণ করবে। গুরু পান মোটা বিদাই—সেট্‌কে সেট্ বাসন। সোনা চাঁদি তামা পিতলের এক এক প্রস্থ। গাড়ি পাল্কী ঘোড়া হাতি, বাসের পাকা বাড়ি খাটপাতা, তাতে মোটা গদি। ধেনো জমি, ধান আসবে দ্রোণ সহস্র সালঙ্কারা কন্যে কুমারী আলতা কাজলে সেজে বেনারসী জড়িয়েছে, পাত পেড়ে পেট ভরে খায়। দম্পতিবরণে লাগে জড়োয়া গয়না এক সেট্, সাড়ী বডিস্ স্ত্রীর; পোইর জন্য জুতো এক জোড়া ছাতি একটি, দউরাস্থুরবাল পটুকা টুপি। মাথা ন্যাড়া বামুনরা পায়—টাকাপুরে ডেলা পাকানো খোয়ার এক এক ঢ্যালা। কাঙালীরা অন্নে বস্ত্রে তৃপ্ত। ইতরজন অজস্র, যার যা প্রাপ্য, ধরে নিল।

সবই ভাল, ঝামেলা বাঁধায় 'কাটেখানে বাহুন'।

তার বাইনক্কার অন্ত নেই। এদিকে সে সন্তুষ্ট না হলে শ্রাদ্ধ পণ্ড, আত্মার সদ্‌গতিতে বাধে। একথা ব্যাটা টের পেয়েছে। কিছুতেই বলে না—আমি খুশি। সাধ্য সাধনা যথারীতি, দরাদরি চল্লিশ

ছাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজারে ওঠে।

বিরাট ত্যাগ তার। রাজাকে উদ্ধার করতেই সমাজচ্যুতি, জাত খোয়াতে হবে। এর পর সে আর জল আচরণীয় নয়, পাতে বসতে পারে না। বংশ পরম্পরায় নীচ, কলঙ্ক কালিমা মুখে লেপে অন্ত্যজের মত একটেরে পড়ে থাকবে। কি হবে দান দক্ষিণে জমিজমা হাতি ঘোড়া হয়ে হতমানের চাড়া নেই।

রাজা মরেছেন সুইজরলণ্ডে। যাবার বেলা ৺গঙ্গা লাভ হয় নি তাই বেনারস থেকে বামুন আসে। ধনরত্ন দিয়ে ধনী করে, বিধিমত পূজোর পর তাকে পায়সে পাক করা অস্থির কিঞ্চিত গুঁড়ো খাওয়াতে বিস্তর বাদ্যভাণ্ড বাজাল। বেনারসীর পেটে কল্লোলিনী গঙ্গা তদর্থে রাজার হাড় গঙ্গায় পড়ে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। এ দিকে এই কাটে খেয়ে বামুনের হোল সবংশে পতন। তাকে এইমাত্র চতুর বামুনেরা দ্বিজোত্তম ফিজোত্তম কি সব বলে ষোড়শোপচারে পূজো দিল। কাজ ফুরোলো, পাজি বলে গলাধাক্কা মেরে সমাজের বার করে দিয়েছে। এ দেশেও তার থাকা চলবে না। হাড়খেকো রাক্ষসকে ঢোল ডগর বাজিয়ে দেশ ছাড়া করে ছাড়ে। এ কী অবিচার! রাজাস্থি পেটে পুরে রাজাশিং যে উচিত মত সেজন মাথায় চড়ে সমাজ শাসন করবে। তা নয়, একি এ তার শোচনীয় অধঃপতন।

সন্ন্যেসীকে পুলিশে ধরল। ভারি তো সন্ন্যেসী! জটা নেই, গেরুয়া না, ইস্তক দাড়ি চিম্‌টে নদারৎ, ছাইভস্ম না হয় ছেড়েই দিলাম। সাদা ধুতি ফেরতা দিয়ে পরা, টিকি নেই, সেই যা। মোল্লাও তো হোতে পারতো, নুর নেই, কাজেই যোগী।

একান্ন পীঠের এক পীঠ গুহ্যেশ্বরী, ভৈরব স্বয়ং পশুপতি। অধিষ্ঠাত্রী মা কালী, কাঁচাখেগো দেবতা। ডিমের কুসুম মুরগির টুটি ছেঁড়া তাজা রক্ত পাঁঠার মুণ্ডু আর পোড়া ল্যাটা মাছের চাট্ যোগে কারণ

নিয়ে মহানবমীর ভোগ রাগটা সারছিলেন। সন্ন্যেসীটা দেখে নাক শিট্‌কেছে।

আর যায় কোথায়, খপ্‌করে পুলিশে ধরল।

নাস্তিক বিধর্মী কোথাকার, দেবতার অবমাননা! দেশে কি রাজা নেই, ধর্মরক্ষক! দেখবে এখন মজাটা, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেশ ছাড়া করবে।

সকালবেলা মহারাজা সিংদরবারের দরদালানে দাঁড়িয়ে প্রজার নিবেদন আবেদন শুনছেন, যোগীকে এনে হাজির করল। তিনি সন্ন্যেসীর পানে তাকালেন—সনাতন হিন্দুধর্ম নিশ্চয়ই মান, দেব-বিভূতির অগৌরব করেছ তুমি?

মহারাজ, ধর্মাবতার, আপনাতে আমাতে দূরত্বের ব্যবধান অন্তরায়। কি করে বোঝাবো, কেন কী করেছি। গুটি দুই কথা বলতে পাই, যদি অবসর দেন।

মুখের কথায় কি ছিল, জানি না, বিচক্ষণ রাজা দু'টোয় দরবারে আসবার অনুমতি দিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠের সাধু এক নেপালে এসেছে, ভেক নেই তার বিবেক টন্‌টনে। রাজাকে একান্তে কি বোঝালো, সেই জানে, মহানবমীতে মহারাজার তরফ থেকে 'কোতে' মহামায়ার একশো আট মহাবলি বন্ধ হয়ে গেল। জগজ্জননী নিজ সন্তানের তপ্তরুধিরে স্নান করবেন না, অজাপুত্রেরা বেঁচেছে।

কালে লোকাচার আর কুলাচারের ঠ্যালায় তথাগতের বাণীর ঔজ্জ্বল্য ঝাপ্‌সা মেরে যেতে, মহাযান হীন যানেরা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে নাস্তিকতায় ব্যভিচারের বান ডাকায়। সে হলাহল মথিত করে হোল শঙ্করের আবির্ভাব। লোক সাধারণ অকূলে কূল জেনে অধ্যাত্মে অধিষ্ঠিত সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থা ফিরে পেয়েছে।

অথ পশুপতি কথা।

দেবতা তো বৌদ্ধদের মেরে কেড়ে নিল, পূজুরি পাবে কোথায়? সব মদে মশগুল্, ভাঙ ধুতুরো কে আর ছোঁয়? শঙ্করের দেশের বামুনরা এসে পাশপৎ মহাদেবের পুজো শুরু করে দিল। আজ পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম হয় নি। একজন গেলে, সুদূর কর্নাট থেকে আর একজন এসে হাজির হবে। মদ মাংস অস্পৃশ্য, ঘী আটা চট্‌কায়।

চারমাথা যন্ত্রকে তো দেবাদিদেব মহাদেব করা গেল, ছাগলখেকো চামুণ্ডাচণ্ডীকে সামলায় কে? বৌদ্ধযন্ত্রে মাতা গুহ্যেশ্বরী অধিষ্ঠিতা, পুরুৎসব তামসিক। খাঁড়া ধরে—ফৈসালা কবে, যুক্তি তর্কের ধারে কাছে যাবে না। কিছুতে বাগ মানে না, সমাজের বার ব্রাত্যচণ্ডাল হয়ে থাকল। দেবী হিন্দু হলেন, এই যা লাভ। ওদের হাতের নৈবেদ্যেই তুষ্টা, তার আমরা করব কি?

নেপালে শিবরাত্রিমেলা, লক্ষ যাত্রী জুটল। হাজার যোগী অগুন্‌তি নাগা, গৃহী ত্যাগী যে যার এসেছে পাহাড় টপ্‌কে পশুপতি সন্নিধানে। দারুণ শীতে তাদের ধুনীর লক্কড়, ওদরের রোটি, মৌতাতের গাঁজা ভাঙ দিচ্ছে, নেপাল সরকার দরাজ দিলে। যাবার বেলা, লোটা-কম্বল দান দক্ষিণে পাবে, যে যার মান মর্যাদা মাফিক।

অনিলাহারি বাবা এসে চিম্‌টে গাড়ল। স্রেফ হাওয়া টেনে জান জোগায়, পানাহারের ঊর্ধ্বে। দর্শনার্থীরা বাবার ডেরা পশুপতি বাসুকীস্থানে ভেঙ্গে পড়ে। বাবা যোগাসনে বসে থাকে চেলারা আগ্‌লায়, নিমীলিত নেত্র নির্বাক সমাধি। চারদিকে ভিড়, আছে হাঁ করে চেয়ে, জ্যোতি বেরোয় কিনা দেখবে। চতুর্দশীর রাতটা বড় ধাক্কা গেল, 'হর হর বোম্' করে মন্দিরের চার পাশে ঘুরে, তামাম রাত বাবার খোঁজ খবর করেছে। প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে একবার তাকান তো কেল্লাফতে। পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা হয়ে গেল সে, লোভ কার না হয়? শীতটা যা বেয়াড়া, হরেক রাতে হয়ে ওঠে না

তাই। দশটা বাজতে না বাজতেই সকলে চুপচাপ কাঁথা কম্বল টেনে নেয়।

মাহাত্ম্য হাওয়ায় উড়ে রাজার কানে যেতে, চেলাদের ভোগে দুমণ দুধ হোল বরাদ্দ। ওটুকুই পায়, নূতন কিনা, বিশুদ্ধ হাওয়া পর্যন্ত উঠতে এখনো কিছুটা বাকি। এটাই কী কম বল, বাচ্চার মত শুধু মিল্কফুড! জয়জয়কার, মুরোদ মত দর্শনী দিয়ে যাচ্ছে সব।

'রমতা যোগী, বহতা পানি' সাফ থাকে, চিমটে ওঠে। বাবার এক-চোখো হলে চলে না, চারদিকে পাপীতাপী, সবদিক দেখতে হচ্ছে। যেটুকু যা প্রসাদ পেল তাই নেপালের ভাগ্য।

কোটিপতি পশুপতি।

বিরাট জমিদারী, কিমতি তোষাখানা। হীরে জহরত সোনাচাঁদি জমেছে বেশ, কাছারি আছে ম্যানেজার রয়েছে। দুগ্ধ মধু ঘী· দই চাই মোণকে মোণ, একশো আট ঘড়া জলে চান হয়। অঙ্গরাগই কি কম? কাঁড়ি কাঁড়ি চুয়াচন্দন ঘষা হচ্ছে, গন্ধদীপ চারদিকে চক্‌মকে চাই। কী ভোগের বাহার! ভাতের পাহাড় বানিয়ে বলেন অন্নকুট। এই কন্‌ট্রোলের বাজারে এ আদিখ্যেতা শোভা পায়? যাক্, মোটামুটি আছেন ভাল। শিবরাত্রির জঞ্জাল সাফ হবে।

অনিলাহারি বাবার আস্তানা, চাটাই সরেছে। ও হো হো, কী আঘ্রাণ! কোঠায় ঢুকতে গেলে ধাক্কা মারে। তেলেইঁটে ছাওয়া পরিষ্কার মেঝে; ঘরে কোথায়ও কিছু নেই। এ যে বিট্‌কেল গন্ধে দম আট্‌কায়। এগোয় সাধ্য কার, বাবা এ কী করলে। কাছারীতে রিপোর্ট হোল, ম্যানেজার এসেছে—মাঝের ইঁটগুলো নাড়ানো মনে হচ্ছে না?

নাকে পুরুকাপড় বেঁধে ঝাড়ুদার ইঁট সরাতে, নিচে বিরাট গর্ত ভর্তি বাবার কীর্তি বেরিয়ে পড়ে। মানুষের শরীর তো, জ্যোতিপাগল

ভক্তের দল নিবৃত্ত হোলে, গভীর রাতে বাবা খোয়াভোগ লাগায়। বার ভেতর হবার কি জো রেখেছে? হাজার দৃষ্টির পাহারা। প্রকৃতির তাগিদ মিটিয়ে দিয়ে, মাতুর পেতে, আসন করা চলছিল। ক'দিনেই যেটুকু যা ছেড়ে গেল, তাতেই সব অস্থির।

উপকণ্ঠে বাগানঘেরা যে বাড়িটা একান্তে ঘুমায়, দিন বিশেষে সেখানে বসে জুয়ার আড্ডা, আমরা বলি 'খাল'।

জুয়ার খালে হরেক মাল—রক্সী রাঁঢ় বাটপাড় সাউকার আর জুয়াড়ি চার—একুনে অষ্টবজ্র সম্মিলন হলেই খেলা জমে। ছিপা লোটা জরু যাঁতা, হাতের নাগাল যা, তা বেচে বিকিনে নেপালী জুয়া খেলে। পরের ধনে পয় পেতে যেন উন্মত্ত ভৈরব, ইহকাল পরকাল পায়ে মাড়িয়ে গেল। দান ফেলে দিয়েই ধনবাহাদুর বুক ঠোকে—মারা—মাবা এ বাজিটা তার বাঁধা ধরা। হায় কপাল! ষোলকড়ির চাল—চিৎ বলতে পট্ হয়, পাঞ্জা ধরে ছক্কা হোল—বাহাদুরের হার। সাঙাৎ তিনটির বাজি, ফিলফাজিল চাখের থাপাটাকা, খালবালার বাহাল, গুণাগার গুণে দিতে ট্যাঁকে টান ধরে। চোখ ফুটলো, তবিল নিঃশেষ তখন জুয়াচুরি নজরে পড়ে, কুকরি বাগিয়ে গেল তেড়ে—কাটুছু। আসর ছত্রভঙ্গ, খাল পয়মাল, প্রাণ বাঁচাতে পালায় সব, হরে নিয়ে গেল ধনের ধন। আসরের আবেশ ছুটে সর্বহারা মন চলে নিজ নিকেতন।

শকুনি মামাই দীক্ষাগুরু। জনতার জবরচাপ সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায় যখন, মলথসের মতে কুরুপাণ্ডবে ভেড়ালো। জুয়ার যোগাযোগে কুরুক্ষেত্র করে, কাটে মারে পাতে ঝাড়ে নির্বংশ হতে ধরিত্রীর ভার লাঘব হয়েছে। পরাবিদ্যায় পরাঙ্গম শাস্ত্রী সে দিব্যদেব, নেপালী শাস্ত্র মানে তাই পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে। চাট-চর্বৈনা-চুরোট—মোটা কথায় ভাজাভুজি চিবোয়, আর কে গলা ভিজিয়ে নিশিদিন

কড়ি ভাঁজে, আহার নিদ্রা হারাম। কালীপূজা ধরে পাঁচদিন যমপঞ্চক-অক্ষক্রীড়া প্রশস্ত, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়। তা জুয়াড়ীর বরাতে দেখি, গোড়ারটা বড় একটা ফলে না, ফলে অপরটা, হরবখৎ চোখে পড়ে।

চল যাই শাঁখু।

মাতা বজ্রযোগিনীর দর্শন পাবে, জল হাওয়া উত্তম। মাঘের মাঝামাঝি, এখনো কলাপাতা সবুজ আছে। বিকেলবেলা কামিজ গায়ে বেড়ানো চলে। টিলের উপর মানানসই বস্তি বাজার, সব জিনিষ পাওয়া যায়। কোঁ কোঁ ক্যাঁ ক্যাঁ করলেও মোটর বাজার পর্যন্তই উঠে আসে। উত্তরে উঁচু পাহাড় মাথার'পর দাঁড়িয়ে, পাশে নদী গভীর খাদে বয়ে চলে। উপরে যাও গোঁসাইথান, নিচে নামলে ভাতগাঁ পৌঁছে যাচ্ছ। নদীর ওপারে ঘনবন, নিচে থরে থরে সাজান সবুজ শষ্যক্ষেত্র। যেদিকে তাকাও মনোহারিণী শোভায় চিত্ত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

ইন্দু আর আমি,. এক দুপুরে মোটর চড়ে উঁচু নিচু ডিঙ্গোতে ডিঙ্গোতে বিকেলবেলা শাঁখুর নাগাল পেলাম, বারো মাইল পথ। আরও একমাইল পাহাড় চড়ে বজ্রযোগিনীর দর্শনলাভ হোল। পূজুরির মস্ত বাড়ির ছোট্ট কুঠুরিতে বসে গরম গরম ঘী খিচুড়ী খেয়ে, শীত তো, গুটিসুটি যে পাশে শুই, সেই পাশেই ভোর হয়।

চন্‌মনে মন, হালকা শরীর, ইচ্ছে যায় পাহাড়ে চড়ি। দেখি, পাহাড়ীরা থাকে কোথায়, ঘরকন্নাই বা কেমন করে।

সকালবেলায় ঠাণ্ডা, গরম জামাকাপড়ের'পর ওভারকোট টুপি চাপিয়ে দুটিতে উত্তরমুখো পাহাড় মাপছি।

পথে সাথী জুটল হরিপ্রসাদ। দুক্রোশ উপরে কাউলে গাঁও ঘর, বাজার করে বাড়ি ফিরছে।

বলি—চল ভাই তোমার গাঁয়ে যাব।

সাথীর মনে সন্দেহ ঘনায়—আমরা অব্যর্থ কাছারিয়ালা।

বলি—ও সব কিছু না, বেড়াতে যাব।

সে তা মানবে কেন, সরকারী লোক সে অনেক দেখেছে। প্রশ্ন করে—কার বাড়ি, কি কাজে যাচ্ছেন? যত বলি ও সব কিছু নয়, অবিশ্বাস ততই বাড়ে। পাহাড়ী পাক্‌দণ্ডি ঘুরে ফিরে উপরে উঠেছে হরিপ্রসাদ, এক গুম্‌টিতে গা ঢাকা দিল, আপদ সঙ্গে করে গাঁয়ে ঢুকতে সে নারাজ।

ডাকি—হরিপ্রসাদ, ও ভাই হরিপ্রসাদ—কোথায় ভাই হরিপ্রসাদ, কাকস্য পরিবেদনা, সাথীটি বেমালুম সরে পড়ল।

এক ক্রোশের ওপর পাহাড়ে উঠে এলাম, সকালে খেয়েছি শুধু চা, খিদেয় নাড়ি চিন্‌চিন্ করতে লেগেছে। বেলা বেড়ে তুপুরের কাছে এসে গেল, চন্‌চনে রোদ, নিচে নামব না উপরে উঠব, দিশে পাই না। গাঁ-র কোথায়ও আছে কিনা, কে বলবে? গাঁ বলতে তো দেখছি—গভীর খাদের ওপারে, দূর আকাশের গায়, এখানে সেখানে ছড়ানো তু'চারটি ঘর দেখা যায়। সাথীটি বলেছিল না—তু' ক্রোশ। এক ক্রোশ আরো উঠে যাই, কাউলে গাঁও পেয়ে যাব। উঠছি তো উঠেই চলেছি, গাঁ আর মেলে না। পেট চোঁ চা লাগাল, গলা শুকিয়ে আসে। কোট ওভারকোট টুপি, কোথায় ফেলি, কি করি, ভেবে পাই না। গা ঘেমে উঠেছে।

মাথার ওপর একটা ঘর দেখা যাচ্ছে না? রাস্তা তো জানা নেই। ধাপে ধাপে মকাই খেত গেছে উঠে, গাছগুলো কেটে নিতে খুঁটি সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই ধরে একধাপ হতে ওপরে অন্য খেতে উঠতে লেগে গেলাম, ঘামে নেয়ে উঠি।

ঘরের নাগাল মিলল।

হাঁপাতে হাঁপাতে দোরের সামনে আসতেই ফোঁস্‌ফোঁসানি আওয়াজ!

দেখি, আমাদের দিকে গোল্লা গোল্লা চোখ পাকিয়ে এক মোষ দড়ি ছিঁড়তে প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি পিছু হটে এলাম।

হতাশ নয়নে ওপরে নিচে তাকাই, মনে হয় আরও ওপরে আকাশ ছুঁয়ে একটা গাঁয়ের মত দেখা যায়। চল, ওখানেই যাব। রাস্তার দরকার কি, মকাইর খুঁটি তো আছেই। হাঁপাচ্ছি আর খুঁটি ধরে রপ্তে রপ্তে ওপরে উঠছি। বহু কসরতের পর এবার গাঁ পেলাম—মাথায় খড়ের ছাউনি দোতলাঘর, মাটি-পাথরের দেয়াল।

বেশবাস বোধ হয় ও পরিবেশে বেমানান, গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল। ঢুকে দেখি, এ যে শূন্যপুরী, রূপকথা হতে বাস্তবে নেমে এল। অন্দরে কন্দরে গরু বাছুর ছাগল ভেড়া ঘাস-পাতা চিবোনো ভুলে অনিমেষে আমাদের দেখছে। অবস্থা এতই 'দয়নীয়,' ওরাও হতবাক, কি আর বলবে? এ ঘর সে ঘর ঢুঁড়ে ফিরি হাঁক ডাক যথেষ্ট দিলাম, জনমানবের দর্শন দুর্লভ।

ছোট্ট গাঁ, গাঁয়ের প্রান্তে এসে গেলাম। দেখি, আর্ত ত্রাণ করতে দেবী আবির্ভূতা, করুণাময়ী পার্বতীরূপে। ছোট্ট কুঁড়ের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা আমাদের দেখছেন। ছুটে কাছে যাই—আমরা দুটি প্রাণী বেড়াতে এসে বিপদে পড়েছি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

দেবী প্রসন্না হলেন। দাওয়ায় মাদুর পড়তে দুটিতে গড়িয়ে পড়ি। দুদণ্ড দম নিয়ে, উঠে বসে খেলাম এক এক ঘটিজল। ধড়ে প্রাণ এল।

মা বলছেন—এদেশে চাল মেলে না, মকাইর রুটি গড়ে দেব কি?

—তাই দাও।

পাশের ঝরণায় মন্ত্র স্নান সেরে এলাম। বেশ ঠাণ্ডা বরফ গলা জল, ছুঁতে মন সরে না। মকাইর চক্রাকার ভারি রুটি রায়শাকের ঝোল আর•শোংয়ালা তিলের চাটনি যোগে সুস্বাদ হয়ে ওঠে। তারপর মায়ের দেওয়া এক এক বাটি ঘোল খেয়ে ভোজন সাঙ্গ

হোল, সম্বিৎ ফিরে পেলাম। চাটাই ফরাসের আরাম এনে দিয়েছে। এখন দেখি গ্রামস্থ সজ্জনেরা গুটি গুটি আমাদের তত্ত্ব-তল্লাস করতে সমবেত হচ্ছেন—কি কবা হয়, কোথায় নিবাস—সেই মামুলি জিজ্ঞাসাবাদ।

আমরা যে কোন মতলব রাখি না, স্রেফ কুতূহলে বেড়াতে এসেছি—এ কথাটাই বোঝানো শক্ত হয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই উদ্‌ভ্রান্ত বাতিকগ্রস্ত বেওকুফ্ আধুনিক যুবা। নতুবা সহরের চাকচিক্য ফেলে এই পাহাড় কন্দরে কাঁটা জঙ্গল ভেঙ্গে বেমতলব উঠে আসবে কেন?

যাক্, কষ্টে বোঝাতে পেরেছি—আমরা আর যাই হই, আড্ডা কাছারির কাজে আসি নি, বিশুদ্ধ ভ্রমণকারী।

এবার কর্তারা শিষ্টালাপে গ্রাম্য অভাব অভিযোগ সুখ দুঃখের কথা পাড়েন—সহুরেরা এত সুখী। গাড়ি ঘোড়া অট্টালিকা জল-কল বিজলি-বর্তিকা, উপভোগ্যের অন্ত নেই। আমরা দুঃখী, অভাব অনটনের মধ্যে একটেরে পড়ে আছি।

বলি—ওই যে হিমচুলী, অনির্বচনীয় প্রসন্ন অট্টহাসে চমৎকার সুপ্রভাত জানিয়ে, চকিতে চকিতে অভিনব বর্ণসুষমার ব্যঞ্জনায় তোমার মনোরঞ্জন করে। আর তার সেই সন্ধ্যার মনোলোভা লালিমায় বিচ্ছুরিত অপূর্ব বর্ণালির সৌন্দর্য বিন্যাস, কাকে তুষ্ট করতে বল? স্বচ্ছ রোদ বিশদ জোছনা নির্মল বাতাস শুদ্ধ শীতল প্রস্রবিনী তোমার সেবায় নিত্য তৎপর। সবার সেরা নিসর্গ শোভায়-ঘেরা কিন্নরলোকে এই সুস্থ জীবনযাত্রা। এত ঐশ্বর্য তবুও বলবে, তোমরা দুঃখী!

যাই হোক, আখের মাতব্বরেরা রায় দিলেন, মানতেই হবে—সহুরেরাই সুখী।

এবার ফেরার পালা। উপস্থিত সকলের ছবি তুলে নিয়ে, মায়ের

কাছে বিদায় চেয়ে পথিপ্রদর্শকের সাহায্যে পাহাড় ঝরি। মাতা বজ্রযোগিনীর সন্ধ্যারতি অন্তে শাঁখু ফিরে এলাম, আর ভুল হয়নি।

উত্তরে তিব্বত, কোল ঘেঁসে তার আছে থাক। থাকের লোকেরা থকালি, কন্যেরা কহায় থাক্‌সিনি। নেপাল ঠেলে চাল গম, তিব্বতী আনে নুন পশম; বেচা কেনায় মুনাফা হাতায় থকালি। অবীরা থাক্‌সিনি পাহাড়ে ঘাঁটি আগ্‌লে বসে আছে, রূপের পসরা মেলে। টুক্‌টুকে রং, অঙ্গশোভা মনোলোভা। নাকে নাকছাবি, উপুড় করা সোনার ধামা যেন, কানে সোনার মোটা রিং, লতা লেপ্‌টে পড়ে আছে। তেল জুব্‌জুবে বেণী জড়িয়ে ধরে, ললিতে মধুরে যোগ সাধল কোইরালা ফুলের মোহনমালা। গায়ে লম্বা হাতা চোলি, নায়িকার নধর বক্ষে চড়াই উৎরাই পেরুতেই শেষ হয়ে গেছে, নিচে আর গড়াল কৈ? কটি তটে তাই পটুকা কোমরবন্ধ তার দশহাতি দৈর্ঘ্যে সাড়ীর কোঁচা জাপ্‌টে ধরেছে মোহিনীর। পৈতের মত হয়ে সাতনরি পোতে, কাঁধে কোমরে সেতুবন্ধ। বাজুবন্ধে বেলোয়ারী চুড়ি, মরি মরি কী মাধুরী, নিটোলে রঙ্গীনে জড়াজড়ি।
সেই হাত যবে ডাকিবে তোমায়, বলে রমা—চিয়া তৈয়ার ছ, পালনুস্‌ হুজুর—দিবা নাই হবঁ হে, থাকল তোমার দুনিয়াদারি। নিচে পশল, বিকিকিনি দোকানদারি, ওপরে বৃন্দাবন। দুধারে মাটির অল্প উঁচু ভীত, বোতলে রক্সীসুরা, পানপাত্র চক্‌চকে মাজা পিতলের ছোট্ট কটোরাবাটি। থালায় আছে সেলরুটি, কড়ায় আলুরদম মাংসের সুরুয়া। পাশে ছোট্ট টেবিলে সাজান কাপ প্লেট, উনানে কেৎলি হুস্‌হুস্‌ ধোঁয়া ছাড়ে। প্যাকেটে বিস্কুট আর সস্তা চুরুট, বিলাসিনী সব সম্ভার সামলে বসেছে।
মিষ্টি হাতের ফিকে চা খেয়েই মোহমুক্তি হোল তো?
ওরে ও অবোধমন, তোর তরে নহে এই উৎসব আয়োজন, শক্ত হ।

মধুর মুস্কানেই গলে গেলে, পেয়ে গেলে বুঝি অমৃতের আহ্বান? ও শুধু সাদর সম্ভাষণ, সোনা বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক, মুখ খুললেই মনে হবে হাসছে।

আসবে কবে মাইনে পেয়ে লাহুরে, বৃটিশ গোর্খার ছুটিছাটায় পাহাড় ঘরের পথে। তারই তরে এ বাসরসজ্জা, এ নহে তোমার তরে। দেখবে আদর সোহাগ, কী সে উথল পাথল। ঝোরা ঝাপ্টা কিট্ব্যাগে, গুন্টা বিছানা মস্ত তোরঙ্গ, অন্দরে উঠেছে। হবে আন্তরিক আলাপচারী—নানীলাই সঞ্চো ছ, কুশলে আছো তো কন্যে?—হজুর লাই আরামৈ হোলানি, শুধোবে হজুরের সহিসলামৎ বিনোদিনী। বিকচ নলিনে শতদল উৎফুল্ল আজি রে!

আসবে চা-বিস্কুট মাস্থ্ রোটি রক্সী সুরুয়ার সঙ্গে মিঠে কড়া চাট্। সুন্দরী ভরিবে দয়িত করিবে পান।

মধুরে মধুরং, সুধাভাণ্ড নিঙাড়ি নিঙাড়ি প্রেয়সী হোল অন্তরঙ্গ। তাবৎ নেশার ঘোরে বেহুঁস নায়ক শুধু ডাক দেয়—দাও সাকী দাও ভরপিয়ালা।

আস্তে আস্তে নাকে ঢুকতে কথা, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এগিয়ে এল ঘুম। ভোরে বিষাদে বিস্বাদ মরদের পা টিপে ঘুম ভাঙ্গায় অপ্সরী, দেখা যায় শিথানে খালি বোতল এক ডজন।

—কি ঢালাটাই ঢাললেন হুজুর। আমার দোকান খালি, পাশের পশলের মাল এনে টাল সামলাই। হুজুরের মর্জি তো ফেলানা না, কী ছলনাই জানে মায়াবিনী!

এদিকেও মেজাজ টাইট্—কুছ পরোয়া নেই, লে আও বোতল, খোঁয়ারি ভাঙ্গতে হবে।

চলল পান, হোল হয়রান, হজুর আবার ঢলে পড়েছে।

দু'দিনেই এ ব্যাটার সব সম্বল নানীর ট্যাকে ওঠে, চাবিছাবাও ওতেই সমর্পণ করেছে, কোন পরম মুহূর্তে। অর্থ শূন্য নাগরে

প্রয়োজন নেই আর, এল অনাদর। সবদিক দিয়ে দেউলে লাহুরে বাক্স প্যাঁট্‌রা জামা জুতো বেচে, যা কিছু কিঞ্চিৎ হাতে করে ফিরে গেল নিজের পল্টনে। থাকল এ যাত্রায় তার পাহাড় ঘরে আপন-জনের সঙ্গলাভ।

এ বাঁক গায়—এ কাঞ্ছি চন্দনীকো উকালৈমা লিঁউলা মায়া লাই।

ঘরকো ছায়া বরকো ছায়া পিপলকো কে ছায়া,

পুতলি যস্তো বাটামা পাঁয়া ঘরকে কে মায়া।

ওগো মেয়ে ও ছোট ঝিয়ারী ও আমার কুড়িয়ে পাওয়া স্নেহ পুতলি, কি ছার আর ঘরের মায়া, চল, চন্দনী পাহাড় পারে দূর দেশান্তরে।

ও বাঁক সাড়া দিল—

ও মাইলা ময়ালু, মাইতালে ত নযাউ ভঞ্জু

পোইকোমায়া লাগ্‌ছ।

বাড়ুলা যস্তো কম্মর ছৈন, ফরসি যত্রো চাক্‌ছ।

ও মধ্যমকুমার, হে আমার দরদী, হায়, নিদয় নৈহরের নিষেধ। তুম্হিই বল, ভোমরার মত কটি, এগুরু নিতম্ব ভার, বিধুরা প্রণয়ীকে নিরাশ করবে কি?

পাহাড়ের এ পিঠ ও পিঠে ঘাস কাটে তরুণ তরুণী কেটা কেটি। নিচে নদী বয়ে গান ধ্বনি ছড়ায় নিকট হতে দূরে। আস্তে ধীরে দুটি উদ্বিগ্ন হৃদয় লয়ের পথ ধরে ঘনিষ্ট হয়। নয়নে নয়ন পাতল, ঝড় উঠেছে বুকে, কুটোর মত উড়ে গেল মনুর শাসন। রঙ্গিলা যৌবন তার মীনকেতন মেলে আকাশে, মরতে স্বর্গ নেমে এল। মানব তা মানবে কেন? সমাজের হাজার নিষেধ বিধান, আবেগের মাথায় মারে ডাঙ্গশ। গ্লানিকুট ছড়িয়ে দেয় গোলাবী নেশার সুধা পাত্রে, ধিক্কার জেগেছে চৌদিকে। রাজদ্বারে ন্যায়দণ্ড উদ্যত দেখা যায়। বয়স্সের আবেদন অগ্রাহ্য তার কাছে, জাত বিচার নিয়ে আসে ইন্‌সাফ। সপ্তপদীর দাবি তুচ্ছ করে প্রাণের বধূকে। পরকীয়া-

পারগ চণ্ডীদাস এদেশে জন্মায় না। উচ্চ নীচের এ মিলন অবৈধ ব্যভিচার। নায়িকা ঢুকেছে জেনানা জেলে, নায়ক সাধারণ ফাটকে, ও দু'বছর এ চার বছর থাকবে আটক। অধিকরণের দায় মিটে এবার পতির ক্ষতিপূরণ। জার শোধাবে সাধুর বিয়ে খরচ কাঞ্চনমূল্যে, অপমানের খেসারৎ বাবদ তার পায়ের তলা চাট্‌তে হবে *নাগরকে।* অপদস্থ স্বামী এতে করে ক্ষুব্ধ চিত্তকে সান্ত্বনা দিতে পারে। জারকে দিয়ে পৈতালু চাটিয়ে সমাজে সাধুর মান অক্ষুন্ন থাকে।

শাঁখুর পথ ধরে উত্তরাখণ্ডে, যাবে কিন্নরলোক ছেড়ে ঊর্ধ্বে অপ্সরলোকে। পথে পড়ে গোঁসাইকুণ্ড। মহাদেব বাবা হ্রদের জলে সটান পড়ে দোর আগলান, কেউ দেখে, কেউ দেখে না, ভেল্কি-বাজির দাও প্যাঁচ। গাঁজাটা খাঁটি বালুচরেস বরফ জলেও ঠাণ্ডা হবার নয়। শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করে চল, সরে পড়ি, জমে যাব নাকি ? নিচে দেখ, হাজারে হাজারে ভেড়া, রোমশ চ্যংরা ছাগল উপত্যকায় চরছে। দুষমনের মত ভয়ঙ্কর ভালুক মার্কা কুকুর, এডিয়েসরা ছাগল ভেড়া কান ধরে ঝাঁকে গোটায়। নেকড়ে, গিদর নানা শত্রু সব, লড়ে মেরে রক্ষা করতে হয় মেষপালকে। আর একঝাঁক ঘোড়া তাড়িয়ে নিয়ে এল, সেই রক্ষক বটে। গদ্দা বল্‌গা অবান্তর, তীরবেগে ছুটে চলে ঘোড়াগুলো, তড়িঘড়ি পাহাড় চড়ে। বায়ুর ভাগটাই বেশী ঠেঁসেছেন বিধাতা। আরোহী বীরপুরুষ। সাড়ে ছ'ফুটি মজবুৎ কদ্, উন্নত নাসা গৌরাঙ্গের। গালটা টক্‌টকে বেদানার রং, জুল্‌ফি ঘাড় ছুঁয়েছে। পাশে ঝোলে ছোরা। জামা সদ্য ছাড়ানো ভেড়ার ছাল, মাংসের দিকটা প্রত্যক্ষ। পায়ে হাঁটু ছোয়া উঁচুবুট সেলফ্‌মেড। মাথায় ফেল্ট হ্যাট কানে একজোড়া জবরদস্ত জড়োয়া মাকড়ি।

এ যে তান তোলে গুহাচারী বলিষ্ঠ স্বরে! ঝঙ্কৃত হোল্ সমতল, গম্‌গম্ করে গিরিকন্দর সে নিনাদে। কাকে এ আকৃতি ?

আরও জনাচারেক স্বামীর আদরে গরবিনী হৃদয়ে অনুরণন তুলবে কি ? সব ক'টি ভায়ের একমেব প্রেয়সী সে, ভাগ করে সোহাগ বিলায় জনে জনে। তা, মেঘে ঢাকা অম্বরে, পলকে দেখা চন্দ্র-লেখাই বা কী কম মধুর ? অনুরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান।

পালকের রাত দিন কাটে অধিত্যকা হতে অধিত্যকায়, চারণ ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে। নিঃসঙ্গ যাযাবর জীবন, মুক্ত আকাশ তলে। কাঁধে করে আছে ছাল ছাড়ানো পশুর ধড়। এক খণ্ড মাংস কেটে নিয়ে পাথরে থেঁতলে মুখে নেয় আর ঝরণায় জল আঁজলাভ'রে খায়। কষ্ট, সে কষ্ট আবার কিসের ? রাতবিরেতে জ্যাদা ঠাণ্ডা বোধ হলে, ডু ডু করে খানিকটা দৌড় দিলেই তাতে গা, এসে যায় ঘুম। আর এ কি তোমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার আঁই ঢাঁই, পড়ে রয়েছে যেমন সুঁদরি কাঠের তক্তা একখানা। ঘর কোথায় তার ? চল, আরো উঠে ঐ বরফ পড়া শিখর পানে। ঐ দেখছো ভুটিয়া পল্লী, দোরে বাঁধা চমরি গাই। পাহাড়ের গায়ে উত্তুরে হাওয়া বাঁচিয়ে, দক্ষিণ মুখো রোদ পিয়াসী গুহাগুলি। মাথাটা শ্লেটে ছাওয়া, ওটাই সহজে মেলে কিনা।

চমরি পরম বন্ধু ; দুধ মাংস ,গোবর হাড় কাজে লাগে, প্রয়োজনে ভারবাহী। তৃণ শূন্য বৃক্ষ.বিহীন ন্যাড়া পাহাড়, কস্তুরীমৃগের বিলাস-স্থল মাটির তলার গুল্ম খুর দিয়ে তুলে খায়, লেজে চামর দোলায়। দুধ বাঁট ছেড়েই জমেছে যেন পাথর, মাংস কাটলে শুকিয়ে কাঠ। কুড়োল নিয়ে দুধ কাট মাংস কোটো, খলে গুঁড়িয়ে দুধ মাংস ধুলো কর। তবে হ্যাঁ, মাখনটা যা হোল, খাওয়া চলবে, মাখাও চলবে মুখে। হিমেল হাওয়ায় মাখনের পমেটম্, মুখ রক্ষা করে। যবের ছাতুতে দুধ মাংসের ধুলো, চা আর একডেলা মাখন দিয়ে লেই বানাও, টুক্‌চা নুন ছাড়তে ভুলো নি যেন। কাঠের খোরায় -ধরে গরম গরম তাই সপাসপ্ গিলতে হবে, জমলেই আবার

কাঠ কিনা। বর্ষার পর নিচে নেমে ঘাস পাতা টেনে আন, ছাতু নুন নিয়ে এস সহর থেকে। অগ্রহায়ণে বরফের আস্তর পুরু হতে ঘর গেরস্থালী ডুবল তার তলায়। ঘাস পাতা চমরি ছাগল নিয়ে গেরস্থ গুহায় বন্দী, তপস্যা শুরু হোল। চার মাস অজ্ঞাতবাস, এক হাঁটু বরফের তলায়। কোথায় গৃহ, কোথায় বা গৃহী। চমরির হাড় গোবর জ্বালানি, আলো হাওয়ার ফোঁকর হতে এক থাবড়া বরফ নিয়ে লেই রান্না হবে। তা, সকালে চাপলে বারোটা নাগাদ খাওয়া হলেও হতে পারে। পরিবার পরিজনেরা ঘোড়া ভেড়া ছাগল খেদিয়ে সহরে নেমে গেছে। বিনিময়ে যা অর্থ পেল, তা নিয়ে যাবে দিল্লি লাহোর ঢাকা শহরে। কস্তুরী কম্বল ভুটিয়াকুকুর নিয়ে 'হকিব' পাথর বেচবে।

মলয়ানিল বয়, চল ফিরে অপ্সরলোকে, যার যেথা ঘর। অধঃ-লোকের হাওয়া রোগে ভরা, টান্‌লে কষ্ট হবে, ঐ চূড়োয় উঠে, বরফ সরিয়ে, আবার সংসার পেতে বসে।

রাজকাহিনী

ভুজবল খাঁটিবল, হরহামেশ তৈরী। অসময়ে জোগায় জান, লায়েক বেলায়েক সমাধান, জানেন শুধু ভগবান।

লোক হয়েছে লোভী, ফাঁকি দিয়ে মারে টাকী। তাবৎ কুদরৎ করামৎ নিজে মরে পুড়ে, জ্বালায় অপরে, হেরেও হারে না। ডারউইন কপি বংশোদ্ভুত, ছেঁড়াছিঁড়ি স্বভাব—অযোগ্য যাক—যোগ্য থাক—বলে সে চালাক। অগ্রজাধিকার মানে না—ও খাবে, আমি খাব না—এই তার বাহানা। মেরে কেটে করেও শেষ, নিঃশেষ করে না। বাকি কটাকে ধরে কাঠ কাটায়, জল টানায়, মুখে আওড়ায় অসভ্যকে সভ্য করার দায়। জেলের বাইরে মার্কিনি দস্যু সেও ভদ্রলোক, অসভ্য বুঝি মায়ারা? এ মামলার ফয়সালা শিকেয় থাকে তোলা।

নাগ হ্রদ নেপাল উপত্যকায় মঞ্জুশ্রী চীনি খাল কাটে, জল গড়িয়ে যায়। সেথায় থাকে নাগেরা, সাপ খোপ খায়, নিতম্ব চাপড়ায়, নাচে গায়। বর্ষা হয় প্রচুর, গজায় ভাল ঘাসঘোস, আহির আনে ছাগল গরু মোষ। উৎপাতে সাপ পালায়, পালিয়ে গেল ভেক, নাগরাজ্যে উদ্বেগ, খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। নাগেরা চটে, গুহা হতে বেরিয়ে এল একহাত নিতে।

আহিররা দুধ খায়, পেল্লায় জোর গায়, ধরে ঠ্যাং, আছড়ে নাগ মশাইদের করে দিয়েছে ব্যাং, বসে পড়ে খুঁটো গেড়ে। থাকবি, না হয় রইলি, মিছে কেনে আগুন জ্বালালি? ফাল গড়ে মাটি খোঁড়ে

দুধেভাতে খায়, কোঁৎ কোঁৎ বগল বাজায়—কিরাতিরা মৃগয়ায় এসেই দেখে ফেলেছে।

সবিস্তার রিপোর্ট পেয়ে, গুষ্ঠিশুদ্ধ্ এল ধেয়ে। গয়লার বাহুবল অস্ত্র গদা মুষল, ডনটানা গা, ঐরাবৎ চেহারা, মুখে ছাড়ে হুঙ্কার, মাশ্‌ল রগড়ায়। কিরাতিরা তাক করে, তীর মেবে কাবু কবে, কাছে ঘেঁষে না।

ছিল গুষ্ঠিতে গুষ্ঠিতে লড়াই ভিঁড়াই, সোমরাজ নিমিষে বের করে ফন্দি। রস দিয়ে বশ করে, লোক টেনে দলে, করে বসল লোকবলে নেপালী রাজা বন্দী।

রাষ্ট্র আজকের নয়, সীতা স্বয়ম্বরে যেতে রাজা সুধন্বা, জনকের ভাই কুশধ্বজের কাছে কুস্তি হারে, রাজ্য হারায়। কিরাতিরা হুম্‌তী অর্জুনের সঙ্গে ছোঁড়ে তীর গুলতি। তার ব্যাটা জিতদ্রাষ্টী পাণ্ডবের হয়ে মহাভারত লড়েছে।

সব দেখে মনে মানি রাষ্ট্র সুপ্রাচীন, এ নহে অর্বাচীন।

পঞ্জাবে সিকিন্দর পুরুকে করে সরু, জো পেয়ে মৌর্য করে তাড়া পালিয়ে এল নন্দ,—এল লিচ্ছবি। চীনে কুবলয় বানায় বারুদ, দামাস্ক গড়ে ইস্পাৎ, তাই দেগে চিৎপাৎ মুসলমান করে। হিন্দু রাজারা সদলে গা ঢাকা দেয় গিরি গুহায়, হিমালয়ের নিরাপদে নেপালে চলল। আসে দেবপাল, এসেছে সেন আর মল্ল।

মহেন্দ্রমল্ল সিক্কা ছাপাবেন, স্বকীয়মুদ্রা রাজ্যৈশ্বর্যের প্রতীক। মুঘলের ভাগ্য তখন মধ্যাকাশে, নেপালের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তার অনুমতির অপেক্ষা রাখে। রাজা দিল্লি গেলেন অনুমতি আনতে। দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, তাঁর দরবারে কল্কে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সুযোগের সন্ধানে ফেরে, রাজা মহেন্দ্রমল, পারিষদদের বৈঠকে আনাগোনা তাঁর।

দাবাখেলা চলে, ছু'একটা দান বাতলে বলে দিতে, সবাই জানল দাবায় পাকা হাত। বাদশা অবসর মত দাবার ছক পেড়ে বসেন, আমির ওমরাহ মৌকা পেয়ে রাজার কথা কানে তুলে দিয়েছে। দরবারে তলব হতে, বাদশাহের হুজুরে কুর্নিশ করে দাঁড়ান নেপাল নরেশ।

দাবার আসর বসে অবসর বিনোদনের উপায়, তা, এমন জায়গায় চাল আটকালো, নট নড়নচড়ন, কেউ আর চাল চালতে পারেন না, গালে হাত রেখে ভাবছেন আর ভাবছেন, মুখে কথাটি নেই, সময় তো বসে থাকে না, বয়ে গেল।

ছক পাতা রয়েছে, দোরে আগল পড়ল, প্রহরা বসল, যে যার চাবি নিয়ে ঘরে গেছেন। পরদিন সময় হতে, ঘর খুলে আসর বসে। সেই গালে হাত দিয়ে ভাব আর ভাব, চাল এগোয় না। আবার খেলা থাকে বন্ধ, কুলুপ ঘোরে।

রাত ছুটো, জোড়া রিসল্লা এসেছে, বাদশার জরুরি তলব রাজাকে অবিলম্বে হাজির হতে হবে।

উঠেই রাজা বলেন—জান্ যায়গা তো যায়গা, ঘোড়া নহি দেগা, যাও আসছি।

রাজা জামা জোব্বা চড়াচ্ছেন, সওয়াররা ফিরে গেল।

কিরে, দেখা পেলি?

জেগেই ছিলেন বোধ হয়, হুকুম শোনাতেই, উঠে বলেন—জান্ যায়গা তো যায়গা, ঘোড়া নেহি দেগা—এই এলেন আর কি।

যা, আসতে হবে না, বলে আয়।

চোখে ঘুম নেই, ছুটিতে সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যস্ত করে হাঁটুকে একটি সূত্রই পাক্‌ড়েছেন। নুড়ো জ্বেলে দাও অমন খেলায়, মাথা খাওয়া খেলা এই দাবা খেলা।

গোল্লায় যাক্ খেলা, বাদশার ফরমান্ হাসিল হোল। মহেন্দ্র মল্ল

দেশে এসে চাঁদির টাকা বের করেছেন, বলে 'মোহর'। রাজার মোহর ছাপ বুকে, তাই 'মোহর', ইস্তক নাগাদ চলন চল্‌তি নেপালী রূপেয়া লোক সাধারণ একে 'মহেন্দ্রমল্লী' বলেই জানে।

রাজা জয়প্রকাশ মল্ল দুঃস্বপ্ন দেখছেন, তুল্‌জা ভবানী রুষ্টা, রাজার কল্যাণ নেই। গ্রহাচার্যেরাও নানা সংশয় প্রকট করে—রাজার ভাল হবে না। চারিদিকে অমঙ্গলের নিদর্শন দেখে রাজা মনে সুখ পান না, গ্রহ-শান্তি স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠিত হতে লেগেছে। ভাদ্রমাস, 'ইন্দ্রযাত্রা' এসে গেল। ইন্দ্রধ্বজ খাড়া করে, বৃষ্টি-জলের অধিকর্তা ইন্দ্রের আরাধনা করলেন রাজা। দিগ্‌পালদের প্রতিমূর্তি জ্যান্ত কুমারী গণেশ ভৈরব যথারীতি লক্ষণ মিলিয়ে নিয়ে সুসজ্জিত রথে রেখে, রথের সামনে রাজা নগর পরিক্রমা করেন। সেপাই সান্ত্রীরা কোমর বেঁধে দশের সঙ্গে রথ টানে, পুণ্য লুটবে। উৎসব মুখর নগরী, লোকে লোকারণ্য, মহাধুমধাম।

নগর প্রান্তে এসে রাজা দূত মুখে হঠাৎ খবর পান, নগর আক্রান্ত, যাকে বলে দিনে ডাকাতি। দুর্দান্ত শত্রু গোপনে পুরে প্রবেশ করে, সিংহাসনে বসে, সামনে যাকে পায়, মেরে কেটে উৎসন্নে দেয়। অপ্রস্তুত বিহ্বল নৃপতি, ত্বরায় বাগমতী পেরিয়ে বনে ঢুকতে রাজ্য মান সব গেল, নেপালে গুর্খা প্রবেশ করেছে।

মুঘলদের ডাণ্ডার ভয়ে, বহু রাজপুত সর্দার হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে ছোটখাটো রাজ্য নিয়ে ছিলেন, পৃথ্বীনারায়ণ তাঁদের একজন। নেপাল উপত্যকার উত্তর পশ্চিমে গোর্খায় তাঁর বসতি, তদর্থে লোক সমাজে পরিচয় গুর্খা।

নেপাল রাজ্যের উপর বরাবরের লোভ, সুবিধে হয়ে ওঠে না। একবার তো এগুতে গিয়ে, কীর্তিপুরের চাষা জ্যাপুদের ঢেলাভাঙ্গা মুগুরের ঘা খেয়েই ফিরতে হোল। জ্যাপুরা ছোটভাইটিকে ধরে,

চোখ উপড়ে নিয়েছে।

বলে হয় না, এবার ছল। অর্থে উপঢৌকনে সভাসদ্দেব হাত করতে তারা নানা বিভীষিকা সৃষ্টি করে, সরলমতি রাজার মনোবল সরায়, শত্রুকে পুরে ঢোকাল।

নেপাল দখল হতে পৃথ্বীনারায়ণ, কীর্তিপুরের সবকটার নাক কেটে প্রতিশোধ নিতে ভোলেন নি, কীর্তিপুর হোল 'নসকট্‌পুর'।

অবদল্লাসে ক্যহে দেও—মুলুক নিরালী হ্যায় ঃ
ওহ ক্যা বাল উখারে গা, ওহ তো গোরখালি হ্যায়।'
কহে কবি ইক্‌বাল, কঠিন ঠাঁই নেপাল।

শহরের বুকে দীঘিটি, আকাশে আঙুল উঁচিয়ে থাকে স্তম্ভ। গোর্খালীর এ দম্ভ, সহে না গোরাবাবা ; বলে—'ভীমসেনস্‌ফলী' ইতিহাস বলার একচেটিয়া অধিকার তার, নেপালে ভারতে ভূভারতে।

ওরা তুলেছে 'ওক্‌টরলনী মনুমেণ্ট', গোর্খাবিজয় ধ্বজা, তাই বলে কি মিনার গড়বে থাপা ভীমসেন? শোনে না যে ওয়েলেজলীর বাক্‌-চাতুরি—রক্ষা সৈন্য সহ সহায়ক সন্ধি প্রস্তাব মনোহারী। তোর শিল তোর নোড়া, তোর ভাঙি দাঁতের গোড়া।

এই মন্ত্র জপে, দখলে আসে একের পর এক রাজ্য। কানে নেয় না যে কথা। পাথরের ঘায় নাক করেছে ভোঁতা, কোম্পানীর রাজ্যবিস্তার আট্‌কায়। তার থাকবে কেন কোন স্মৃতিচিহ্ন, তিব্বত বিজয় 'ধরারা', অসহ্য তা।

গোরা, তোমার জারিজুরি ভাঙবে ভীমের গদা, দরবার যদি না হয় বাধা। বিলকুল মন হুস্‌, গুজ গুজ ফুস্‌ফুস্‌, কেবল কানাকানি। রাজার সামনে মাথা নিচু করেছ, ঘমণ্ডী। চোখ মেলে চাও, পাষণ্ডী। মন খুলে কিছু বলার উপায় নেই, পাহাড়ী স্বভাব তাই। হাত-পা

মেলার ঠাঁই নেই, মাথা শয়তানের চরকি। কাজে অকাজে কদর্থ, কথায় কথায় ষড়যন্ত্র কুমন্ত্রণা।

তাতে আবার তেরহুতানি, রাজার নয়নমণি। পশুপতি সন্দর্শনে যেতে পাগল হন রণ, ওরূপ নেহারী। ব্রাহ্মণী মৈথিল ঘরণী, হয়ে রাজরাণী, দাঁও পায় রমণী। পাকা করে দখল দেহাণী, হাতে ধরে বাগডোর, পুত্র হবে নেপাল-নরেশ!

এর আগে ছিল বটে, সে এক তেরহুতানি। নেপালে তখন 'বিফর' বসন্তে বহু প্রাণহানি, জোড়া রাজকুমার তাতেই মরেছে। সান্ত্বনা দিতে রাণীকে, রাজা প্রতাপ খোঁড়েন, 'রাণীপোখরি'। নগরের মধ্যমণি সুন্দর পুষ্করিণী, মাঝে তার শুভ্র দেউল অনিন্দ্য শোভন। পঞ্চতীর্থজলে বিধিমত পবিত্র পুকুর। রাজারাণী পিঠে চেপে পাহারা দেন, দয়ারাম হাতি চালায়। শোকে দেখ, সব হয়ে আছে পাথর।

পুলিশের সেপাই দিলবাহাদুর সিং ফিটফাট পোষাকে সেজে এল। হাতে হাতঘড়ি চোখে চশমা আঁটা, বয়স তা চল্লিশের এপার ওপার। বিশ্বাসী পরিদর্শক দরকার, বাছাই করছি। আপিসের লোকেরা একে এগিয়ে দিল, বিশেষ ভরসা করে, যেমন চৌকোশ বুদ্ধি ধরে তেমনিই।

—বাড়ি কোথায় তোমার?

—আজ্ঞে, পুবে এক নম্বর পাহাড়, চাতরা সিমলেটার।

—সংসারে কে কে আছেন, বাপ মা আপ্তজন কেউ?

—আজ আঠারো বছর ঘর ছাড়া, বাপ মাকে ঘরে ছেড়ে এসেছি। এখন তাঁরা ইহলোকে না পরলোকে, কোথায় আছেন, কি করে বলি হুজুর, ও মুখো হতে পারি নি আজও।

দু'একটা কথা বলেই বিদায় করি। সকলে আশা করে আছে, এরই হবে। আমি বলি—ও চলবে না, বাপ-মার খোঁজ রাখে না নিরালম্ব

সন্ন্যেসী, হাকিমকে দরদ দেখাবে কী ?

দেশে দেশে কলত্রানি, দেশে দেশে চ বান্ধবা—কথাটা এদের দেখেই লেখা। যেমন আছে, পুত্র কলত্র হয়েছে। আবার সব বেমালুম ঝেড়ে ফেলে, চলে এল স্বতন্ত্র পরিবেশে, প্রজাপতি নবীন ডেরায় অভিনব সংসার পত্তনে মশগুল। চিত্তে নেই ইতরজনোচিৎ নির্বেদ। কোন বন্ধনে আটকায় না, নির্লিপ্ত মুক্ত পরুষ। বিবেক দংশল আদৌ সহ্য করে না, তাই খাঁটি সেপাই।

পাক্কা সেপাই জঙ্গ বাহাদুর, জান্‌মালের তোয়াক্কা রাখে না, যুবরাজের পাশে পাশেই আছে।

রাজহস্তী ক্ষেপে রাজধানী তছনছ করে ফেরে, সামাল সামাল রব ওঠে চৌদিকে। কে এগুবে, কে সামলাবে তাকে, প্রাণ নিয়ে পালায় সব। যুবরাজের অনুচর জঙ্গ বাহাদুর হোঁৎকা যেমন, নির্ভিক তেমনই। হুকুম হোল—রোখো ওকে।

আজ্ঞা মাত্র হনুমান, একলম্ফে উঠে চালায়, আর লাফে হাতির পিঠে চড়ে চালায় কুকরির মোক্ষম ঘা। চরম মুহূর্তে হতবুদ্ধি বুঝেছে মরদের পাল্লায় পড়েছি, পাগলামো ছেড়ে সুবোধ বালকের পানাহাৎ-শালে সেঁদোলো। দেশসুদ্ধ লোক হতবাক্, হাঁ করে চেয়ে থাকে।

কুদ্‌রৎ দেখিয়ে পল্টনে বেশ খাতির জমিয়ে নেয় জঙ্গ বাহাদুর, রাণীমার সুনজর তার'পর। রাজা পূজা আর্চা নিয়ে আছেন, রাণী রাজ্য চালান। তবে যে যুগের যা, দরবারি ষড়যন্ত্র যাবে কোথায় ? একে টপকে ও উঠতে চায় ওপরে, প্যাঁচা পেঁচির অন্ত নেই। মাতব্বর সিং প্রধান অমাত্য, তাকে হিংসে করে রাজরাণীর প্রিয়পাত্র গগন। রাজরোষে প্রাণ দিল মাতব্বর, এবার গগনের মহামন্ত্রী হবার পালা। গগন সিং সকালবেলার রোদে জানলায় বসে পূজো করছে, সামনের বাড়ি থেকে গুলি এসে বিঁধলো, মলো। একেবারে পাগল-পারা মহারাণী হুঙ্কার ছাড়েন—প্রতিশোধ চাই, কে এই আততায়ী, ছিন্নমুণ্ড

আন তার, দেখব।

জঙ্গ বাহাদুর এগিয়ে এল, শত্রু নিপাতে সাহায্য করব বলে। তার পরামর্শে, হোম্‌রা চোম্‌রাদের ডাকা হোল রাজদরবারে জরুরি মন্ত্রণা সভায় সে রাত্রে।

'হনুমান ঢোকা' দরবারে সাত ভাই জঙ্গ বাহাদুর সশস্ত্র তৈরী, অনুগতেরাও কম নয়। সমবেত প্রধানদের একের পর এক ডেকে দরবারে নিয়ে যাওয়া চলে যথারীতি। যিনি যাচ্ছেন, তিনি আর ফিরবেন না। রাজসকাশে পেশ হবার আগেই তাঁকে যমদুয়ারে চালান দেওয়া হয় পর পর। নেপালী ভুজালির কেরামতি বাইরে ভাই ভারাদারেরা কিছুই জানতে পারে না।

এই 'কোৎপর্বে', বড় বড় একান্নজন নিকেশ হবার পর ব্যাপারটা ফাঁস হয়। আর কি, অমানিশায় দক্ষযজ্ঞ শুরু হোল, কাট মার রোখে কে ? তবে কিনা জঙ্গ বাহাদুরের দল তোয়ের ছিল, অপরেরা বেএখ্‌তিয়ার, বেশী মারা পড়ছে। রাণী মা দিশেহারা। খুন খারাপি সামলাতে জঙ্গ বাহাদুরকে সর্বাধিকার সঁপে জরুরি ফতোয়া দিলেন—আজ হতে জঙ্গ বাহাদুর, বজির-উল্‌-মুলক, রাজাজ্ঞা সব তার মারফৎ বেরুবে। তামাম দুনিয়া যেন তা সর্বথা পালন করে। ক্ষমতা হাতিয়ে জঙ্গ বাহাদুর কড়া হাতে বিপক্ষ দলের অজুহাতে রাজ্যের বড় বড় আসন ভায়েদের ভাগ করে দিলেন, নিজের তখ্‌ত পাকা করে বসাচ্ছেন।

রাণীমা দেখেন বিপদ, তিনি কেউ নন। অধিকার সব জঙ্গ বাহাদুরের দখলে, সেই মর্জি মাফিক হুকুম চালায়, এঁকে বড় একটা কেয়ার করে না।

জঙ্গ বাহাদুরকে আঁটবে, এমন পরামর্শদাতা কোথায়, সব ফৌত হয়ে গেছে। মন্ত্রণা চলে, 'পূজাকোঠে' পুরুত বামুন, দৌবারিকের সঙ্গে। রাজবাড়ির লাগোয়া এক ভুলভুলৈয়ার কেন্দ্রস্থল 'ভাঁড়ারখাল'

রাজকোষ। একবার ঢুকলে, সাতপাক না ঘুরে, সোজা বেরুবে, উপায় নেই।

যুক্তি হোল, জঙ্গ বাহাদুরকে সেখানে ডেকে এনে আটকে মারা হবে, রক্ষীরা প্রস্তুত আছে। রাজাজ্ঞা শোনাতে যায় পুরুতঠাকুর। রাণীমার কাছে তো সাহস দেখিয়েছেন ভাল, এদিকে এগুতে বুকের ভিতর ঢেঁকি ওঠা নামা করতে লাগল। মুখের আদল যা, দেখামাত্র চতুর জঙ্গ বাহাদুর হ্যাঁচকাটানে সব কথা বের করে নিচ্ছেন। একের পর এক। হাপুসনয়নে কেঁদে কেঁদে, করজোড়ে সমুদায় নিবেদনের পর, অভয় পেয়ে, বামুন বাঁচল। পাকাপোক্তা তোয়ের হয়েই মন্ত্রী এসে রাজবাড়ি চড়াও হতে রাজা রাণীর লোক কাটা পড়ছে, তাঁরা বারাণসীর রাস্তা নিলেন। 'কুবর' জঙ্গ বাহাদুর, পদবী পাল্টে হলেন, জঙ্গ বাহাদুর রাণা, যা হতে রাণাবংশ।

নাবালক যুবরাজ সিংহাসনে আছেন, 'মহারাজ' খেতাব জঙ্গ-বাহাদুরের, কার্যতঃ তিনিই হর্তাকর্তা, রাজ্য শাসন করেন। আর কোন বাধা নেই। প্রধান অমাত্যপদ এবার বংশানুক্রমিক হয়ে, তাঁরাই সব, নামে মাত্র একজন রাজা থাকেন। সে যা হোক, ব্যবস্থা মন্দ নয়, নিয়মকানুন ধরে রাজ্য চলে, ডামাডোল কম, লোকেরা স্বস্তির নিশ্বাস নিচ্ছে। সুযোগ মনে করে, তিব্বতী হুনিয়ারা ধাওয়া করলে। নেপালীদের হাতে মার খায়, এখন বছরে দশহাজার নজরানা কবুলে রেহাই পেয়েছে।

দু'হাজার গজে জঙ্গ বাহাদুরী মাইল, কিরাত মুলুক জরিপ হবে। মেপেজুপে কিলা খোঁটা মারে, হদ্ চৌহদ্দী ধরে। সারাদিন ঘুরে ঠিক করে রেখে আসে সব, বাস, রাতে ফরসা। কিরাতিরা কারও এখ্তিয়ার বরদাস্ত করে না। তাদের ভুঁই টুকরো টুকরো ভাগ করবার এরা কারা, কেটে ফেলব না? কাটতে আর কেটে মরতে আটকায় না তাদের, খাতের চায় কোন যুক্তি মানে না, কুটচালে

বশ করতে হচ্ছে।
ইস্তেহার বেরুল—একান্ন বিঘে ভুঁই দাখেল দর্জ করাবে যে, সুব্বাঙ্গি পাগড়ি দেওয়া হবে তাকে।
আর দেখতে নেই, সরকারে জমি জরিপ করাবার হোর লেগে যায়। জেলাকে জেলা, সব সুব্বা। হাকিম, একুশ হাতের পাগড়ি কিরাতির মাথায় জড়িয়ে দিয়ে, একান্ন বিঘের রায়ৎ কায়েম করে নিল সেরেস্তায়।
ঘর সাম্‌লে জঙ্গ বাহাদুর গেলেন বিলেত, ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দেখা। মহারাণী শুধোন—রাজা, তোমার সুন্দর রাজ্য, রাস্তা ঘাটের এ দুর্দশা কেন ?
জঙ্গ বাহাদুর বলেন—রাণীমা, এ কী বলছ ? পার্বত্য মূষিক বৃটিশ সিংহ আসার পথ পরিষ্কার করে রাখবে, সে কেমন কথা ?
হাজির জবাবে কুট বুদ্ধি হয় স্তব্ধ, নেপালের লড়াইয়ে ইংরেজ জানে, শৈলবন্ধুরতা দুস্তর বাধা।
তারপর পিকিং গিয়ে চীনিবাদশার কাছে খেতাব পেলেন—থং লিং। পিংমা, কোকাং ওয়াং সেয়াং—চমুর বড় খলিফা, মেকদার মহারাজ। ইংরেজ করে দিল—জি. সি. ভি. ও। নিচে ইংরেজ ওপরে চীন তাঁর দোস্ত, জঙ্গ বাহাদুর গ্যাঁট হয়ে বসেন, এসেছে সিপাহী বিদ্রোহ ভারতময়, জঙ্গ বাহাদুর ইংরেজের সাহায্যে গেলেন লক্ষ্ণৌ।
পুরী আক্রান্ত, লোকলস্কর পালাল সব, কেউ কোথায়ও নেই ; নবাব তখ্‌তে আসীন। আক্রমণকারীরা নবাব সকাশে এসে শুধোয়—এ কী নবাব ! আপনি পালান নি ?
হৈ হল্লা শুনে, একবার বেরুবার ইচ্ছে হয়েছিল বটে, কমবক্তের জুতো ফিরিয়ে দিল না, যাই কি করে ?
তাই তো, নবাব যে ! জুতো ঘুরিয়ে রাখল না, যান কি করে পল্টনের সেরেস্তায় কাজে আছে নেবার। হুল্লোড়ে ভাঁড়ারে ঢুকে, বস্তা চেপে মনের সুখে মুঠো মুঠো খাচ্ছে চিনি। তোষাখানা ভরাই

গুর্খা সেপাই, হাতে মুক্তোর মালা। কুকরির ঘায় মুক্তো গুঁড়িয়ে ফেলে, সোনার তার গোটাতে ব্যস্ত। অরক্ষিত অন্দর; ধনরত্ন বিস্তর হাতে করে জঙ্গ বাহাত্বর দেশে ফিরে এলেন।

সেই যে জঙ্গবাহাত্বর জো দেখালেন, জিঘাংসা রাণা বংশকে পেয়ে বসে। বস্তুতঃ প্যাঁচাপেঁচি পাহাড়ী জাতির প্রাণ সঞ্জীবনী, ক্ষাত্রবল ভিন্ন ধনাগমের নান্যপন্থ্যাঃ। শীত পড়লেই সমতলে নামে, দলেবলে গঙ্গা অবধি ধাওয়া চলবে। পয়সাকড়ি যথা লাভ, হাতিয়ে, পাহাড়ে বসে গ্রীষ্ম বর্ষা কাটায়। গঙ্গার ওপারে যাবে না, সাঁতার জানা নেই, ডুবে মরতে নারাজ। গরম পড়লেই পালায়, 'ঔলো' ম্যালেরিয়া তাড়ায়। ইংরেজ এসে পথ আটকাল, ওমুখো ধাওয়া চলে না, কাজেই ঘরে বসে ঘোঁট পাকাও।

জঙ্গ বাহাত্বর মারা যেতে, ভাই রণোদ্দীপ মহারাজ রাত্রে তেল ঘষান। পালোয়ানে ঘষে, সুনিদ্রার তরে তেল মালিশ। নিঃসন্তান নিতান্ত ভালোমানুষ, ভাইপোদের ভালবাসেন। ভায়েদের সন্তান গোষ্ঠি বড়। আপনা আপনি খেয়ো খেয়ির অন্ত অবধি নেই। মহারাজার চোখে সব বরাবর, সবাই স্নেহের পাত্র। ভাই ধীর সমসেরের সতেরো ছেলে, দলে ভারি, বাপ মা হারারা সহজেই হুর্দান্ত হয়ে পড়ে।

জঙ্গের ব্যাটা জগৎ, ভাইপোমণ্ডলীর বড়, রোল-ক্রমে সেই এবার মহারাজ হবে। মহারাজকে বলে, ধীর পুত্রদের ভারতে ভরতপুর লড়াইয়ে পাঠাচ্ছে, যায় শত্রু পরে পরে।

আদেশ জারি হতেই জ্যেষ্ঠ বীর, ভায়েদের নিয়ে রাত্রেই দরবারে এলেন। সকালেই পল্টন যাবে, জরুরি পরামর্শ কিঞ্চিৎ করা দরকার, নিঃসন্দিগ্ধ চিত্ত মহারাজ ভাইপোদের ঘরেই ডেকে পাঠান, যখন পিঠে তেল ঘষা হচ্ছে, উবু হয়ে শুয়ে রয়েছেন। মুখ তুলে ললাটে গুলি ধরে 'রামচন্দ্র' বলে নিদ্রা যান, সে ঘুম ভাঙে নি। ইদানিং 'বলং

বলং বাহুবলং' অতএব মহারাজা বীর সমসের। জঙ্গ বাহাদুর তনয়েরা ঘূর্ণি ঝড়ের মুখে কুটো হয়ে, হাওয়ায় উড়ে গেল।

তারপর আসেন দেব। তা, কলিকালে দেবভোগ্যে কাঁচকলা ছয়মাসও যায় না, ছলনায় বন্দী মহারাজ দেব সম্‌সের ধানকোটা হয়ে উপস্থিত হয়েছেন মুশুরি। ধীরপুত্র চন্দ্র এখন মহারাজা।

এই হোল শাসন পত্তনের খতেন। তারপর জঙ্গ বাহাদুর প্রবর্তিত রোলক্রম বজায় ছিল। রাণারা রাজত্ব করেন কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী, বড়টি মহারাজ হয়ে। যথা ক্রমে ভীম যুদ্ধ হয়ে, অধস্তন পুরুষ পদ্মমোহন হতে, রাণা শাসনের ইতি। এবে কভু গণতন্ত্রের গণ্ডগোল, কখনও বা নরপতির ছত্রছায়াতল। ডামাডোলে তরী টলমল, রৌদ্র ঝলমল তটরেখা চোখে পড়ে না।

রাজার খেয়াল সাংঘাতিক ব্যাপার। মামুদ তোগলক দিল্লির তখ্‌ত উঠিয়ে নিয়ে যান দেবঘাট। নগরবাসীদের সঙ্গে নেবেন এক কানা আর এক খোঁড়া অসমর্থ, যায় কি করে? হুকুম অমান্য। ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত দড়ি বাঁধা ঠ্যাং ছুটোই পোঁছোয়, হুকুম বাহাল আছে।

রাজার হয়েছে বিষফোঁড়া, ডাক্তার দেখা শোনা করে। মলম পট্টিতে বাগ মানে না, অসহ্য ব্যথা, রাজা আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। ফোঁড়া পাক ধরেছে, চিরে দিলেই শান্তি। বলতেই রাজা বিষম খাপ্পা—বলে কী! রাজ শরীরে, অস্ত্র ছোঁয়াবে?

কষ্টহারী ভেষজ গুণে নরপতি নিদ্রামগ্ন। নিস্তব্ধ দুপুর, ডাক্তার ব্রণমুখ সামান্য খুলে দিতেই বদ্ধ পুঁজ গলগলিয়ে বেরোয়। আরাম পেয়ে রুগী ঘুমুচ্ছে দেখে, বহুদিনের পর বিশ্রামের আশায় ডাক্তার ঘরে গেল।

দিব্বি ঘুমিয়ে উঠেই, রাজা চেঁচাতে লেগেছেন—আমি মরতে বসেছি,

ডাক্তার গেল কোথায় ?

পার্ষদরা নিবেদন করে—আপনি ঘুমুচ্ছেন সুযোগ বুঝে ডাক্তার ফোঁড়া চিরে দিতে, পুঁজ বেরিয়ে আরাম পাচ্ছেন দেখে, ডাক্তার ঘরে গেল।—কী, রাজ অঙ্গে লৌহস্পর্শ! ডাক ডাক্তারকে।

ক্রুদ্ধ নরেশ হুঙ্কার ছাড়েন—এ অপরাধের মার্জনা নেই, হঠকারীকে দূর করে দাও।

ডাক্তার পালাল।

কাল যায়, যন্ত্রণার অবসানে রাজা প্রসন্ন চিত্ত।

বলছেন—তাই তো হে, আতুরের কথা বৈদ্য শুনবে কেন, নিরাময় করা তার কাজ। সুযোগ বুঝে দিল ফোঁড়া ফাটিয়ে, এখন আরাম পাচ্ছি। সে তার কর্তব্যই করেছে।

সাধু সাধু—সভাসদ্‌রা একবাক্যে বলে উঠল।

ডাক্তারকে এত্তেলা হতে, ডাক্তার হাজির।

—এ বাহাদুর বৈদজ্ঞ, জান্ কবোল করে আমার যন্ত্রণা দূর করেছে। একে টাকা দিয়ে ঢেকে দাও।

ছফুট লম্বা ডাক্তার দাঁড়িয়েছে, থলেয় থলেয় টাকা ঢালা চলে, ঢাকতে হবে তাকে। এতে করে লাখোটাকা খেলাৎ হয়ে গেল।

রাম নেই, নেই সে অযোধ্যা। কোথায় অঘোর চাটুজ্যে, রয়াল ফিজিসিয়ন টু মহারাজা, নেপাল। শ্যামবাজারের তেতলার ছাতে হাজার টাকার নোট ইটচাপা দিয়ে ভাদ্দুরে রোদে দিচ্ছেন, দিস্তে দিস্তে, মাথায় গামছা চাপা।

নিঝ্‌ঝুম দুপুরে, নিরালা রোদে বসে ঠায় পাহারা দেন, ব্যাঙ্কের ওপর বিশ্বাস নেই। আর সেই হেমবাঁড়ুজ্যে, এলেন তো মাষ্টার হয়ে, করতে লাগলেন ডাক্তারি। তাতেই কি নিস্তার ছিল, রাজার সখের ঘড়ি বন্ধ হতে, তাও চালু করে দিলেন। রাজা মহাখুশি, সাবাস ওস্তাদ, খলিফা বটে! দিয়েছেন, তালুক মুলুক টাকাকড়ি দিয়ে ধনী করে।

ছিলেন প্রিন্সিপাল বটকৃষ্ণ মৈত্র, ছাতা না খুলেই ছত্রপতি। রাজা রাজড়া টিট্ করা তাঁর কাজ। পরীক্ষা নিকটে এলে, ছেলেরা মিলে, লাইব্রেরীতে টেকস্‌ট বুক খোঁজে, কোন্ পাতায় বটুবাবুর নস্যি আছে লেগে। শীতকালে দাড়িতে বুক ঢেকে, ছাতা বগলে এ ঢ্যাঙ্গা সুন্দর দরবারে দাঁড়ালেন যদি এসে, রাজার বুক ওঠে কেঁপে—এই রে, পড়া ধরে, আসন ছেড়ে বেঞ্চের 'পর, দিলে বুঝি দাঁড় করিয়ে!

লাখ পঞ্চাশ তাঁর খয়রাতি দান, মৃত্যু শয্যায় দেখতে এসে রাজা শুধোন—স্যার, কেমন আছেন?

—শীতে মরে যাই, সরকার একটি কম্বল দিন, গায়ে জড়িয়েবাঁচি।

এসেছেন মৃত্যুঞ্জয় সেন। মৃত্যু, সে মনের কিম্বা ধনের জয় করতে তাঁকে চাই-ই-চাই, হয়ে দাঁড়ালেন অন্দরের খুঁটি।

ঘরে বাইরে, বৈষ্ণব সেবা থেকে গুরু বন্দনা, পয়সার খেলা, পঞ্চাশটা ঝঞ্ঝাট ঝামেলা মাথায় নিয়ে, রাজার মাথা হাল্কা করে রাখেন।

কোটি টাকা খাটে, একটা মাথা বটে, মার বড় একটা খান না। কত ধানে কত চাল, রাজা কী তার খবর রাখেন, লাভের অঙ্ক মোটা দেখেই আনন্দ।

বলেন—মাস্টারবাবু, কাজ তো তুমিই কর সব, মিছে শেয়ার ব্রোকারকে শতকরা তিন টাকা কমিশন খাওয়ালেন কেন? টাকাটা তুমিই নাও না।

—হতে পারে তা, তবে চাকুরিটা আমায় ছাড়তে হয়। মাইনে পাই, কাজ করি, কমিশন আমার প্রাপ্য নয়।

রাজার মুখে রা নেই—যাঃ, বলে ঘাট হোল যে!

তিন জাহাজ ভাড়া করে, রাজা চললেন বিলেত। রসদ মাটি নিয়ে চলেছেন, গঙ্গাজলও আছে হজভর্তি। ওদেশে ওরা তো আর জল খরচ করবে না, শুকনো কাগজ দলে। এঁদের আবার হাতমাটি

করতে হয়, তার মাটি।

অঙ্গরক্ষী পাঁড়ে কর্নেল। নিত্য ব্রাহ্ম মুহূর্তে বাগমতি স্নান অভ্যেস, সেটা যাবে কোথায় ? ভোরে ওঠে নেংটি পরা মহাবীর, 'ব্যোম্ ব্যোম্, হর হর' করে চলেছে টেমস্ অবগাহনে খবর পেয়ে, রগড় দেখতে, সেই কুয়াশা ঢাকা সকালে, কাঁপতে কাঁপতে দলে দলে লোক পিছু নেয়। সাদা আর শীত, তার উঁচু মাথার নাগাল পাচ্ছে কৈ ? বিড় বিড় করে মন্ত্র জপে, মাঝে মাঝে 'মহাদেব' বলে মুখ হাঁ করে মোটরের ধুলো খায়, ওতেও কত অমৃত লুকোনো আছে।

রাজা তো স্ন্যটের' পর রাজছত্র চাপিয়ে, পুব-পশ্চিমের সমন্বয় করলেন, কর্নেলের বিপদ হোল ডিম কিনতে গিয়ে দোকানি ব্যাটা বোকা। কথা বোঝে না, এটা দেখায় সেটা দেখায়, আসল জিনিষের খোঁজ নেই।

ডেকে বল্লে—প্যাক্। এই হয়েছে, ঝুড়ি হাতে তুলে ধরে হাঁস। ঠোঙা থেকে গোলালু। পাখির পুচ্ছ হয়ে আলু ফেলার প্রক্রিয়া দেখাতে ব্যাটার হুঁস হোল, ডিম দিল। সায়েব তো অবিকল না দেখালে কিছুই ধরতে পারে না। ডিম তো দিল, এযে কুমড়ো দেখাতেই তুলে ধরেছে একটা গিনি। ঠাট্টা পেয়েছে নাকি, বোকা বানাতে চায়, রাজদরবারে নালিশ ঠুকে দিল— মহারাজ, এ ব্যাটারা আমাদের ভাবে কী ? জাতে একটা ফরসি, দাম বলে কিনা এক গিনি, আহাম্মক পেয়েছে নাকি ? নৃপতি বলেন—দেখ হে, এ তোমার নেপাল নয়, ফরসি মূলো বলে গালাগাল হয়, নগণ্য তুচ্ছ সামগ্রী। এটা ওলায়েৎ, ওসব এরা কাঁচা খায়। যাও, কি আর করবে, নিয়ে এস।

যথার্থ ভবভূতি ভনে—বজ্রাদপি কঠোরানি। যুবতী স্ত্রী, নাবালক পুত্র, বুড়ো বাপ মার আবেদন নিবেদনে অন্যথা হয় না। চারুমণি

খুনের ‘সাধকসদর’ হয়ে গেল, ভীমদত্ত ফাঁসিতে ঝুলবে গাথগাদী, খুনডাকাতি, রাহাঁজানি বলাৎকার অপরাধ ‘পঞ্চখৎ’। গাথ, রাজার জীবন ; গদি, ঢুংগার খলল, মানে আসনশিলা নাশের চেষ্টা। পঞ্চখৎ সরকারবাদি মামলা। শাস্তির সাধকসদর—রাজার গোচরে নথি পেশ করতে হয়। ভীম দত্ত থাকে সুবে নয়ামুলুক, বাঁকেবর্দিয়া পাতা ভারে। এই পশ্চিম প্রান্তটা আঠারোশো চোদ্দয় ইংরেজ কেড়ে নিয়েছিল, ফিরিয়ে দিয়েছে জঙ্গ বাহাদুরকে। পরাধীনের অভ্যুদয় কোম্পানীর উচ্ছেদ কামনা, তাই রাজনীতিতে জাতীয় উত্থান, সেপাই বিদ্রোহ।

মোহমুদ্গরই তো, ধুরন্ধরের বুঝতে বাকি থাকল কিছু? শক্তের ভক্ত, নরমের যম সব, ঝোপ বুঝে কোপ মারে, লোক বুঝে দোস্তি করে। বাহাদুরের চেপ্টা মুখে চুমো খাচ্ছে—নেপালের মাটি নেপালে জুড়ে দিলাম, অসময়ে দাঁড়ায়ো ভাই জি.সি.ভি.য়ো। হিমঋতুতে সমতলের এ অঞ্চলে এসে যায় ‘পতুরনিরা’, ওপরে দোটির ঠকুরি রাজাদের সভানটী যারা। এবে কর্তা হারা মেনকার গঞ্জে বাজারে মহফিল-মুজরায় নেচে গেয়ে গুজারা চালায়। অমিয়া নিছনি বরতনুর পদ্ম-পলাশ জানি আঁখিঁ, হেফাজতে তার অধরে অমল সীধু, লোভীরা লোপাট করবে। কাড়াকড়ি মাতামাতি, মরে যায় পতুরনি চারুমণি, ধরা পড়ে পন্ত যুবা ভীম দত্ত।

নেপালের মধ্যপ্রদেশ গণ্ডকী প্রান্ত, গণ্ডকী নেপালে নারায়ণী, শালগ্রাম শিলা মেলে। কেষ্টের জীব হাজারে হাজারে কুম্ভীর পুষে রেখেছে পেটে। শীতকালে নদীর চড়ায়, লাইন বরাদ্দ শুয়ে রোদ পোয়ায়, গণ্ডায় গণ্ডায়। সাইজটা দেখো দিকি! কাছে যাবে না, ঝুপ্ঝাপ্ জলে নেমে তলিয়ে গেল। শিকারীরা দূর থেকে শূন্যে তাক্ করে বল্লম ছোঁড়ে। কি কৌশলে জানি না, কুমীরের কেঠো চামড়া ভেদ করে, ফলা পিঠে বিঁধে যাচ্ছে। শিকারীর হাতে

বল্লমের দড়ি, নৌকো টেনে গ্রাহ নদীময় ছোটাছুটি লাগায়। ছাড়া পাবার নিষ্ফল চেষ্টা, অবশেষে চিৎ হয়ে ভেসে ওঠে জলের' পর।

কাথবার্টসন্ হার্পার নামী ট্যানার, কুমীরের গায়ের মূল্যবান চামড়া মেরে নিতে চায়। সরকারে রয়াল্‌টি নজরানা দিচ্ছে মাথা পিছু দশতঙ্কা, রাজার প্রজা যে সব। উত্তম প্রস্তাব, সরকারে পেশ করি।

—কি বললে, অতগুনো জীবহত্যা করে বছরে দুলাখ আমদানী হবে, তাই চাও!

—আজ্ঞে, কি কাজে লাগে কুমীর? ওরা মেরে নিয়ে যাবে, যাক্ না।

—কি কাজে লাগে, জিগেও পশুপতিকে। পাপ বাক্য আমার কানে এলো না, রক্তমাখা টাকা সরকার চায় না।

এ যে দেখি, মৃদুনি কুসুমাদপি।

বানর নর খেচর মাকড়, কিসে আছো রাম, কোথায় নেই, তত্ত্ব গুহালীন।

যে পথ নিল দাদা মাধাই, সে পথ চলি, আমি গদাই।

কালঘাম ঘামেন লছমন সাহেবজী। সিং দরবারে তলব হয়েছে, দোরে রাণা মহারাজের দূত খাড়া, সঙ্গে নিয়ে যাবে। মাঘের হাড় কাঁপানো শীত, রাত দশটা, টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল, শুতে যাবেন, এ হেন সময়ে এই ডাক। দেরি করা চলে না, নগদ যা কিছু, পকেটে পুরে, বাড়িতে বলেন—যদি ফিরি, ভাল, না হলে তোমরা নিজের ব্যবস্থা দেখো। দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়েন। মূল দরজায় পৌঁছুতে, ভিতরে খবর গেল। সিংহদ্বার পার হয়ে, আটকালেন গিয়ে নিচের তলার বৈঠকখানায়। উপরে হুজুরিয়া

জেনারেলের কাছে ফোন যাবে, রাত দশটার পর এসব তাঁর এখ্‌তিয়ারে।

বসে আছেন তো আছেনই, ঘামে জামা কাপড় ভিজে। আধ ঘণ্টার মাথায় ওপর থেকে লোক এল, সঙ্গে নিয়ে যাবে। দুরু দুরু বুকে জেনারেল সাহেবের কোঠায় ঢুকলেন। তিনি সোফায় আধশোয়া, প্রমাণ দশহাতি একটা ফাস কাগজ পড়ায় মন। কি সব টুকে নিচ্ছেন ছোট নোটবুকে, সাহেবজীর পানে ফিরেও তাকান না। এখানেও তাঁর ঘামবার পালা, ঘেমে চলেছেন।

এগারোটা নাগাদ কৃষ্ণের কপট নিদ্রা টুটে। হাই তুলে উঠে বসেছেন হুজুরিয়া—হরি হে, আর পারি না!

সাহেবজী যে! চটপট এটা পড়ে ফেল, আমি টুকে নি। পড়বেন কি? চোথা কাগজে কাঁচা হাতে লেখা—আজ কোন্ রাণার দরবার হতে কার বাড়ি ক'সের আচার মিষ্টি গেল, কার ঘরে কে কে এসে ক'ঘণ্টা কাটিয়ে গিয়েছে। বলিহারি যাই!

পড়া শেষ করে জেনারেলকে শুধোন—এ সব মামুলি খবর নিয়ে হবে কী?

হুজুরিয়া বলেন—দেখ হে সাহেবজী, আমাদের লোকগুলোকে ক'টাকাই বা মাইনে দি, মোদ্দা কথা লিখে আনতে বললে দরকারী কথাই বাদ পড়ে যাবে। ওরা লতাপাতা ঝাড়-জঙ্গল জড়ো করে পাঠায়, আমি তা থেকে খাদ্যগুলো বেছে নিয়ে মহারাজকে পরিবেশন করি। রাত হোল, চল তোমাকে মহারাজার কাছে নিয়ে যাই।

ষোল ঘরে মহারাজার বিছানা পড়ে। বারোটা রাত পর্যন্ত হুজুরিয়া জানেন, কোন্ কোঠায় তিনি আছেন। তারপর তিনি, তাঁরও হুদ্দার বাইরে চলে গিয়ে, সশস্ত্র জেনানার পাহারায় অবস্থান করবেন। বিপৎকালে বোতাম টিপ্‌লেই 'বিজুলি গারদ' তাঁর রক্ষায় হাজির হবে, আর কারো সে পুরীতে প্রবেশ নিষেধ। অগ্রসর হলে, প্রমীলা-

দের ঘেরায় তাকে অব্যর্থ প্রাণ হারাতে হয়।

সিংহ দরবারের হাজার দরজায় হাজার প্রহরী, বুকের সামনে সঙ্গীন উঁচিয়ে 'পেরল' দাবি করে। না বললে পথ দিচ্ছে না। যাই হউক, ফাঁড়ি সব পার হয়, সঙ্গে আছেন জেনারেল, মহারাজার দরজায় হাজির এবার।

তিনি কক্ষের পর্যাঙ্কে অর্ধশায়িত দেখা যায়। বাঁধানো দাঁত খুললেই হাসিরছটা—ও সাহেবজী, তোমার কষ্ট হোল। ভাবলুম পাশা খেলি, তাই তোমার কথা মনে এলো। তা থাক্ রাত হোল, বাড়ি যাও। মাঝে মাঝে হাঁড়ির ভাত টিপে দেখেন আর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে বাঁধানো দাঁতের হাসির কি ছটা দেখে চম্‌কে চম্‌কে ওঠেন, সাহেবজী, রাজার জ্ঞাত ভাই।

রাজাকে জানতে হলে দরবার চিনে রাখ। নীতি বলে—চক্রং সেবং, কল্যাণকামীর চাণক্য স্মরণই বড় শরণ। ইঞ্চকেপ্‌ এ অঞ্চলে অচল, বিরাট যা বিশাল তা। বাহুল্যে বিস্তারে বিকশিত দরবার, ইথে বিরাজিত লোকপাল নরেশ। 'ঢোকেপালে' দোর আগলায়, বৈঠক সাজায় 'ফরাসে বৈঠকে'। 'বগৈচেমালি' ফুল তুলে, মালা গাঁথে। 'কুশলেদামাই' বাঁশির তানে ঘুম ভাঙ্গালো, প্রাতঃকৃত্য নির্বাহ হয় 'পোড়েচ্যামের' কল্যাণে। 'চিলম্‌চিহুক্কে' সটকা এনে গুড়ুক খাওয়ায়। ডাক্তার বদ্যি হাজির, নাড়ি টিপ্‌বে, নিদান নির্ঘণ্ট আউড়ে, তবিয়ৎ সামলে নিয়ে চলে। দাঁতের মাজন বাড়িয়ে ধরে 'করুয়ঝারি' হাতে 'মুখারি' করায় 'শুষারে'। 'নাউ' হজামৎ সারলো, এবার পালোয়ান তেল ঘষবে, চান করায় 'জলকোঠে'। নৈবেদ্য সাজায় 'পূজাকোঠে', পোষাক গোছায় 'পোষাকে'। গুরু কান ফুঁকে দিয়ে, পুরোহিতকে বলেন, পূজো সামলাও। শুভক্ষণ আর মুহূর্ত নিয়ে মাথা ঘামায় 'জোশি,' নিত্য পুরাণ বাচনে আছে পণ্ডিত। দ্বার

পণ্ডিত দ্বারে থাকেন, রাজা বসেন দরবারে। আগমন ঘোষণা করল, আশা সোঁটা হাতে ভাট পণ্ডিতেরা। চামর দোলায় 'চাপরাশি,' ফরমাস খাটে 'আট পহরিয়া'। যার ওপর বিরূপ হলেন, তাকে ধরে নিয়ে গেল 'চপটে'। ঘোড়া সাজিয়ে আনে 'সইস্ সলহোত্রী', সঙ্গে যাবে হুজুরিয়া। আগু পিছু রিসল্লা চলে, 'বোকেছাতে' যাচ্ছে সাথে, পিঠে করবে, ছতরি ধরবে, যেমন যখন করতে হয়। 'ডোলে', 'ঝাম্পান' নিয়ে সিঁড়ি ওঠে।

জোগাড় দিচ্ছে 'ভাঁড়াড়ে', রাঁধে বাড়ে 'ভাঞ্ছেবাহুন'। ডেগ জালা 'ঢাকরেজ্যামি' সামাল দেয় 'নাইকে'। মাছ মাংস জোগায় 'শিকারী', 'গোঠালে' দুধ আনে। খানসামা করে পোলাউ কালিয়া, 'হলবাই' মিষ্টি বানায়। 'পরখিয়া' চেখে দেখায়, তবে রাজা মুখে নেন।

'সাফাধুবি' নিত্য কাচে, 'সুচিকার সার্কি' সেলাই করে জুতো জামা। 'কৌ সিকমি' কাঠ কাটে লোহা পেটে আর 'নকর্মী দকর্মী' মিলে-মিশে যা দরবারটা খাড়া রাখে। 'মিঝারিরা' 'গোলদাউরা' দেয়, তাতে সবার শীত যায়। নাকের কানের গয়না গড়ে 'সুনারবাড়া,' দেওয়াল জোড়া ছবি আঁকলো 'চিত্রকারী'। দেখ, কেমন সাড়ী ছেপেছে 'ছিপা,' তাই পরে নাচবে আজ 'তালি মেনানী', সঙ্গত করে 'তবলচি ওস্তাজ।'

রাণী মহলে আছে 'কেটিরা', বাড়তির ঘরে 'ধাই আমা' দুধ দেয়, ছেলে মানুষ করে। আছে হাজার, বহু বিস্তারে প্রয়োজন নেই। এতেই এখন, তোমার যখন কাজ চলে যাচ্ছে।

এবে এ কেটি কথন।

উত্তরাখণ্ডের হিমবৎ খণ্ডে, স্বপ্নপুরী পোখরার পঞ্চসর পেরিয়ে পরীস্তান হেলম্বু। কহে কেহ নেপালে প্যারী, কেহ বলে রাণার মামারবাড়ি। নবীনা হেলম্বু কেটিরা, দরবারে আসে পালে পালে। রাণার অষ্ট-প্রহরের লীলাসঙ্গিনী, রাণীর হাতে পায়ের দাসী, ছেলেমেয়েদের

নর্ম সহচরী। সাড়ীতে জড়িতে অলঙ্কারে, কুম্‌কুম্ আলতা কাজলে অপ্সরী সেজে আছে। দাসী রাণী পৃথক করা, তুমি আমি পারব না।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, হাঁচিতে কেটি, কাশিতে কেটি, ভিন্নগতি নাহিক আর। নাচের মাস্টার শেখায় নাচ, কালোয়াৎ ভরবে তান্। বুড়িরা ছুঁড়িদের তরিবৎ করে। মহবৎ হাসিল হচ্ছে, কখন প্রভুর কথায় হাসিতে হবে—হা হা হিঁ হিঁ, কবে বা হাসিতে নাই। হাই তুল্‌লে মারবে, ক'টা তুড়ি।

আদৎ আর রূপের গুণে, কেউ বিলাসিনী কমলে কামিনী, কেউ প্রহরণ ধারিনী রক্ষী। রাত্রে রাণার অন্দরে পুরুষ প্রহরী নিষিদ্ধ। কেউ বাঁদী থেকে গেল, বরাত জোরে কেউ হোল রাণী, কেউবা .মহারাণী।

কেটি ফেটি বলে হেলা ফেলা করো না, মুস্কিলে পড়ে যাবে, হ্যাঁচ্‌কা টানে প্রাণ যেতে পারে। এই কেটিরা কত সিদ্ধান্ত টলাল, রানার দেখ, রাজ্য যায় কেটির কারণে। রাজনীতিতে এদের মস্ত হাত।

এ হেন কেটির মাথায় বায়স, বাহ্যকর্ম্ম নির্বাহ করেছে। জানে না পক্ষী, এবে সে নহে কেটি, রাতের মোহিনী মায়ায় হয়ে বসে খাস মহারাণী। এ কী এ বিড়ম্বনা! একি তোমার আমার মাথা, ছেড়ে দিচ্ছে অবহেলে, স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করেই। এ কী এ বিষাদ! কমল লোচনে অশ্রুবিন্দু।

—এঁ হেঁ হেঁ প্রভু, এ যে মাথাময় ধেবড়ে পড়ল। ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্না। রাণাচিত্ত হোল বিচলিত সদ্য।

—বেয়াদব বেহেড সৃষ্টি এই বলিভুককুল নাশ করে দাও।

শুরু হয় গুলি করে কাক মারা, হাজার পল্টন লেগে আছে, কোলাহলে কান ঝালাপালা। ভারতে কবে নাকি কে ফেঁদেছিল সর্প যজ্ঞ, একে না হয় বলি, কাকযজ্ঞ। ঘী নেই, তাই বারুদ পুড়ছে।

আশীর্বাদ করি রাজা হও—শাপ না বর, বলা যায় না। বারোটায় শুয়ে পাঁচটায় উঠতে হবে, বরফ পড়া শীতে ন'টার আগে সূর্যি দেখা দেয় না। উঠে, ভেতরবার সেরে, জামা-জোববা চড়িয়ে কেতা দুরুস্ত মহারাজ বসেছেন। ছেলে ব্যাটার বৌ, নাতি নাতনি অর্থাৎ বাড়ির তামাম শতাবধি আত্মপরিজন, তাঁকে সেলাম জানাতে আসবে। তখন মোটে ছ'টা, অন্ধকার কাটে নি।

ঘোড়া তৈরী, ছেলে নাতিরা চারদিকে বেরিয়ে পড়ে। দু'ঘণ্টা অশ্বারোহণ, সাতটা থেকে ন'টা। যতদূর যায় পারিপার্শ্বিক খাঁটি হাল খবর সংগ্রহ হচ্ছে। সাতটায় মহারাজা দাঁড়ান দরদালানে, নিচে হাজার জনতা ফরিয়াদ করে। বড়লোক হয়েছে বলে ছোটকে পিষবে, সে হবে না। সকালে দু'ঘণ্টা মহারাজার দরবার খোলা, যে. কেউ এসে নালিশ জানাতে পারে।

হুকুম হচ্ছে—অমুক সর্দার, তমুক কাজি এর উজুর বুঝে নিয়ে আমাকে শোনাবে।

নালিশ দায়ের হয়ে গেল, কানা কড়ির খরচ নেই। নিচু বলে জুলুম করলে, কি গেলে। মহারাজার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, অন্যায় প্রমাণ হোলে দণ্ড অবধারিত। এবার মহারাজা ঘোড়ায় চড়ে, আস্তাবল গোশালার তদারক করবেন। ন'টা থেকে এগারোটা, সিং দরবার ইনস্টিটিউসনে প্রফেসারেরা রাজকুমার কুমারাত্মজদের সাধারণ জ্ঞান থেকে নিয়ে বিশ্ব রাজনীতির পাঠ পড়ান। এগারোটা থেকে তিনটে, নাওয়া খাওয়া বিশ্রাম। স্নান সেরে, ঢুকলেন গিয়ে পূজা কোঠায় ইষ্টিপূজো নিত্যপূজো হোম পুরাণপাঠ সেরে ব্রাহ্মণ ভোজন —গোগ্রাস খাওয়াবেন নিজ হাতে।

ঠাঁই হয়েছে। সোনার পরাতে পাঁচপো চালের ভাত ব্যঞ্জন, মাছ মাংস দই ক্ষীর ফল মিষ্টি মোরব্বা বত্রিশটা সোনার বাটিতে সাজানো।

কোনটা চেখে দেখলেন, কোনটা তাও না। খেলেন কি? চারটে শুকনো রুটি, একপো ছাগলের দুধ, দু'ছটাক পটল আর শুকতো পাতার ঝোল।

খাওয়া শেষ হতে না হতে দুনিয়ার হাল খবর বয়ে এল সাংবাদিক, তাজা খবর সব পড়ে শুনে নেবেন। ধুরন্ধরদের লেখা টাটকা বই উড়ে এসে জুড়ে বসে। লাল নীল পেন্সিলের দাগ কেটে তা পড়বেন মহারাজা, মনোযোগী ছাত্র। তিনটেয় দরবারে বসেন।

আদালত পল্টন, হাঁসপাতাল পুলিশ, সহর সাফাই পড়ুয়ে, মোহান্ত নাচিয়ে ভিড় করে এসেছে—তাদের সমস্যার সমাধান চাই। বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে দু'চারজন মাতব্বরকে জুড়ে, বিষয়টা ভাল করে তদন্ত করে সরকারে পেশ করতে বলে ছেড়ে দিচ্ছেন। দেশী-বিদেশী নানাধরণের নানা জন এসেছে, তাদের বক্তব্য শুনে যথা-বিহিত করতে হচ্ছে। বেলা চলে যায়, দম ফেলবার অবসর নেই। শয়ে'শয়ে চিঠি এরপর সব খোঁজ নিয়ে তাদের জবাব যাবে।

এবার একবার হাওয়া খেতে বেরোবেন। মোটর বগী হাতি ঘোড়া পর পর সেজে আছে, খেয়ালমত একটায় চেপে ঘণ্টাখানেক ঘোরা-ফেরা হোল। আবার কেউ ছেলে নাতির বিয়েতে একটা সোনার আসরফি রেখে নেমন্তন্ন পাঠায়, তার বাড়িতে একবার যাবেন। কোন নেকদার কর্মচারী অন্তিম শয্যায় মহারাজাকে স্মরণ করেছে, তাকে দেখে তার পারত্রিক বিধিব্যবস্থা, ছেলে মেয়ে স্ত্রী পরিজনের জন্য অবস্থাভেদে মাসোহারা বা নগদ টাকার ব্যবস্থা করে ফিরবেন, এর মাঝে কখন আবার পশুপতিনাথে নিজের দুঃখের বোঝা নামিয়ে আসতে যাচ্ছেন তিনি। গুণী জ্ঞানী সভায় এলে, তাদের এলেমেরও পরীক্ষা হয়ে থাকে।

ফিরে এসে বসেন, পারিষদদের মন্ত্রণা সভায়। অপর সকলে চলে গেল, আলোজ্জ্বলার সঙ্গে বিশিষ্ট পারিষদ ছাড়া আর কারও ভিতরে থাকার

হুকুম নেই। ন'টা পর্যন্ত জটিল সমস্যাগুলোর জট ছাড়াবার কসরৎ কাবাৎ চলবে।' ন'টায় চোগা জোব্বায়ালারা বিদেয় হতে মহারাজ ঢুকলেন অন্দরে। এবার ব্যাঙ্ক রাজকোষ, ওয়াসালাৎ বকেয়া বতারিখ ইস্তক হাল পর্যন্ত তামাম শোধ, করবেন দু'টি ঘণ্টা। সব শুনতে শুনতে খাওয়াটা সেরে নিচ্ছেন। এগারোটা থেকে বারোটা, হুজুরিয়া জেনারেলের লতাপাতা হাঁটকে আনা বিশল্যকরণী খেয়ে শুতে যাবেন। কত সুখ স্বপ্নই না দেখছেন তিনি, রাজা হয়েছেন!

রাত এগারোটা, ছাউনিতে তোপ গর্জে উঠল। শিগগীর বাড়ি ঢুকবে চল। পনেরো মিনিট তো সময়, তারপর 'রমনরাউণ্ডে' সেপাই বেরিয়ে 'পেরল' পাস্‌ওয়ার্ড দাবি করে। ডিউটিতে যাচ্ছ, পেরল বল কানে কানে। লণ্ঠন হাতে ডাক্তার ডাকতে চলেছ চল, ডাক্তরকে শুধোই ঠিক কিনা। ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। সন্দেহ হোলেই থানায় নিয়ে গিয়ে গারদে ভরবে। সকাল বেলা দারোগা জিজ্ঞাসাবাদ করে, নিঃসন্দেহ হলে নিষ্কৃতি। নইলে ফ্যাসাদে পড়লে আর কি, লম্বা তদন্ত শুরু হোল—কি কোথায় কেন—আটকে থাকো।

ফেরারি আসামী দিব্বি মড়া সেজে খাটে শুয়ে ঘাটে চলে যাচ্ছে। সন্দেহ হোল, শ্মশান বন্ধুরা বেসামাল মনে হচ্ছে যেন, সেপাই মরামুখ দেখবে। কাঁধ দেনেবালা যোয়ানদের ওজর টিঁকে না, গোমর ফাঁস হয়। চারে-একে পাঁচজন ওস্তাদ ঠাণ্ডা গারদের হেফাজতে এসেছে, মরা বলে গলে যাবে, সে হয় না। রাত বারোটা, মহারাজা পাহাড়ী সেজে, এঁদো গলিতে ঢুকেছেন, রমন সেপাই ধরল।

—দেখছো ভাই, গরীব পাহাড়ী, শিখর থেকে শহরে সওদা কিনতে নেমেছি। জানা ইষ্টের ঘর খুঁজে পাই নি, এ গলি সে গলি ঘুরে রাত অনেক হোল, যাচ্ছি কোন পাটি পৌয়া ধরমশালাতে রাত

কাটাতে। মিছে আমাকে ধরে কি হবে, ছেড়ে দাও, চলে যাই, নাছোড়বান্দা সেপাই থানায় নিয়ে চলেছে। এবার টাকা, পাঁচ দশ করে পঞ্চাশে ওঠে, তবু ছাড়ে না।

থানা এসে যেতে, অফিসর মহারাজাকে চিনে ফেলেছে।

রাজা বেরুচ্ছেন ভ্রমণে। দূরের পথ, গোরক্ষপুরে এক বেলা বিশ্রাম। তা মনে করুন, গোড়াপেড়েই ধরুন। আজ উনত্রিশ বছর এ স্টেশনে আছি, মাইনে পাই, দুকুড়ি পাঁচ। ছেলেটা কলেজে পড়ে। কাঁ্যাকশেয়ালে বাড়ি পত্তন করলুম। তা মনে করুন, এখন বলে কিনা, আমার বদলি।

স্টেশন রসকৌল, নেপালের মুখে রসভাণ্ড। রাজধানী, মায় তিব্বত অবধি যত কারবার. এই স্টেশনের সঙ্গে। মহারাজা বীর সমসের, নিজে বিয়াল্লিশ লাখ খরচায়, বারোমাইল সিগৌলী তক রেলপথ তৈরী করান। সীমানা ঘেঁষে নগর বসালেন—বীরগঞ্জ, স্টেশন, তা মনে রসকৌল, বি এন্ ডব্লু আর। আদি অকৃত্রিম মাস্টার সুরেন্দ্রমোহন, তা মনে করুন, সরল মতি। সোজা উঠে গিয়ে ঠেকলেন ছ'ফুটের মাথায় ভারে ধাবে ঠিক আছে, সুঠাম সুদীর্ঘ পুরুষটি জনপ্রিয় অতি। রেল মহাজনী প্রতিষ্ঠান, মাশুলি দিতে কার্পণ্য করে না কেউ। তাদের হাত দিয়ে আমরাই তো দিচ্ছি, তাতেই মোটা মাস্টার মহাশয় মহাজন।

নেপালে চলে পুষ ফাগুণের পালা—মীনপচাস। তখন ভদ্র বড় একটা কেউ রাজধানীতে থাকে না। সমতলে ঝরে, চলে যায় কলকাতা বোম্বাই, কেউ বা জমিদারি দেখতে গেল। রাজা এই অবসরে, শীতকে ছলে, রাজ্য পরিদর্শনে বেরোবেন। হাতি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে ধান খেতে তো আর ক্যাম্প করা হয় না, জঙ্গলেই মঙ্গল। সুমুদ্দুর পারের তানারা প্রায়ই আসেন, কাছেই ঠোরি, বাঘ

ভালুকের বাসা।

মস্থলী মামুলী ঝরে বারোমাস, মৌসুমী বর্ষা শীতকালেই, রাজারাজড়া এলে। অঞ্জলিতে ধরে না তখন, কোঁচড় পাততে হয়, তা মনে করুন।

রাজার স্পেশ্যাল ছাড়বে, মাস্টারের দৌড় ঝাঁপ, সীমা পরিসীমা নেই। অনভ্যস্থ হলেও, সম্মানার্থে কোট প্যানটালুন, ধারণ করেন স্টেশনমাস্টারের চানাচুর মার্কা টুপি। কি জানি, ভুল করে বৃষ্টি অপাত্রে না হয়ে যায়।

সায়েবরা বড় দেখলেই চাঁদি দেখাবে—দেখ যার তিলেক মাত্র নেই। নেপালে নিয়ম, রাজার সামনে মাথায় টুপি চাপা দিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় ওম্ দিতে হয়।

টুপি ঠিক থাকে, শুধু পিছনে সার্টের ঝুলটা ঝুলছে। তা মনে করুন, নজর করে কে, ব্যস্ত সমস্ত সেই লোকারণ্যে।

গাড়ি ছাড়বে, হুকুম হোল—বুড্ঢা কাঁহা ?

আভূমি আনত সেলাম দিয়ে, বিষণ্ণ মুখে মাস্টাব বলে—সরকারের দর্শন আর আমার কপালে নেই, বদলিব অর্ডার এসেছে।

—না, তুমি এখানেই থাকবে, থাপ।

সামনের ঝুলটা তাড়াতাড়ি টেনে, দু'হাতে মেলে ধবতেই, এক মুঠো একশো টাকার নোট কোঁচড়ে পড়ল। গুনলে তা দু'হাজার ছাড়িয়ে যায়।

স্পেশ্যালের আগে চলে পাইলট ট্রেন, স্বয়ং টি এম্ নিয়ে চলেছেন। বলে দিতেই বদলি রদ হয়ে গেল।

ক্যান্টন্‌মেণ্টের কমাণ্ডার কর্নেল ওয়াইলি, মহারাজার দোস্ত, আমন্ত্রণ পাঠাল।

পর পর পাঁচখানা স্পেশ্যাল ট্রেন চলবে, শেষেরটায় মহারাজা

আসছেন। সাড়ে পাঁচশো অনুচর নিয়ে প্রথম স্পেশ্যাল ছেড়েছে, দিনকয়েক আগে সেই গাড়ি থেকে জনা পঞ্চাশেক লোক নিয়ে, আমি নেমে গেলাম গোরখপুর ছাউনিতে, বিশ্রামের তোড়জোড় মেলাতে। কর্নেল হাত মেলাল, অভ্যর্থনা করে।

ছাউনির মাঠে পুরী তৈরী হয়, চক্ষের নিমেষে। কানাৎ ঘেরা শয়ন মন্দির, বৈঠকখানা, রান্নাঘর গোসলখানা।

সায়েবরা তত্ত্ব নিচ্ছে বারবার, কি চাই, কর্নেল কাপ্তান লেফটিনাণ্ট পর্যায়ক্রমে। অতিষ্ঠ হয়ে বলি—আর কিছু চাই না, সাহেব, চাই শুধু বিশ্রাম, তোমাদের ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি।

নিষ্কৃতি পেয়ে টান্ হয়ে নিদ্রা যাই, রাত ফরসা।

লৌকিকতার খাতিরে সকালবেলা গেলাম সায়েবের আস্তানায় আমি আর মণিরাম। খবর পেয়ে গিন্নি ছুটে এলেন—সাহেব ঘুমুচ্ছে, হার্টের ব্যামো। এক্ষুণি উঠবে, আমার বাগানটা দেখবেন কি ?

বাহারে বাগান ; বলিহারি পরিপাটি, গোলাপ রয়েছে রং বেরংয়ের মেলাই। মেমসাহেব দু'জনাকে দুটি তোড়া ভেট করলেন।

সায়েব উঠেই বলে কিনা—চলুন, আমার ছাউনি দেখবেন, বলি—সাহেব, এখন থাক্, তোমার তবিয়ৎ খারাপ, পরে হবে।

কে কার কথা শোনে—প্রথম দর্শনই স্যানিটেসন্। গুর্খা পল্টনের ব্যারাক, নেপালে এরা জল খরচে রীতিমত কৃপণ। এখানে দেখি, তালেমের তরিবতে শুচিজ্ঞান হয়েছে। নোংরামির গন্ধ লেশ নেই, সুমার্জিত সুসজ্জিত সব।

হাটের মাঝে দাঁড় করাল। আমাদের গন্ধগোকুল মুদি, যার গায়ের ঘামে কাজলকালি, কাপড় চিম্‌টোলে পঙ্কতেলক পাই, সুন্দর দোকান সাজিয়ে ছিমছাম সেজে বসেছে। আবলুসে ভিন্ন রং ধরে না তাই, নইলে চেনে সাধ্য কার। চারধারে মাছিমারা কাগজ ঝোলে, সামনে রয়েছে চুনে রং করা ধবধবে দুটি ক্যানেস্তারা, খড়কুটো

জঞ্জাল ওতে ফেলতে হবে। ফ্যাসাদের কি অন্ত আছে? চিরসাথী আরশুলা টিকটিকি মাকড়সা মাছি গোল্লায় গেছে, যাক্। কিন্তু জননী জঠরে রপ্ত করা, টাল মেরে পোয়াতে কাচ্চা সরানো এলেম যেতে বসেছে। সেই দুঃখেই ছাতাধরা দাঁতে অট্টহাসি নেই, বদন-মণ্ডল চক্রাকার। ঝুলছে ঐ ন্যায্য মূল্যের নিরিখ, পরিদর্শক তদারক করে ফেরে, ধরা পড়লেই ঠাণ্ডা গারদে বাস, জরিমানা। না শোধরালে শেষ নাগাদ অর্ধচন্দ্র নিষ্ক্রমণ।

ছাউনির নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিষের দোকান রয়েছে বাজারে, নেই শুধু, ঠোঙা মালসা ন্যাতা পাতা ছড়িয়ে গাঁজানো সুখ্যাত সৌগন্ধ।

এলাম সৈনিক অফিসারদের মহল্লায়। ছবির মত বাগান ঘেরা বাড়ি সব। ছোট বড়, সে পদমর্যাদার অনুপাতে, পারিপাট্যে কেউ কারো খাটো নয়। স্নানাগার, ক্ষৌরাগার কাপড় কাচার ঘর আলাদা আছে, আছে বাচনালয় সমিতি গৃহ ব্যায়ামশালা। প্রতি গৃহস্থের জন্য বরাদ্দ করা সবজি খেত, সপরিবার খেটে তরকারি করে তাতে।

যাদের পরিবার নেই, ব্যারাকে থাকে তারা। জুতোটি মেজে ঘষে ঠিক জায়গায় রাখতে হবে, জামাটি পাট করে তোলা থাকে তাকে, নড়চড় হয় না। খুলে ফেললো বিরাট দরজা টেনে লম্বা গুদোমঘর, খোপে খোপে সাজানো আছে পর পর পেটি পট্টি জুতো জামা। সায়েব বলে—ঘণ্টার নোটিশে পাঁচহাজার সৈন্য দাঁড় করাবার জোগাড় আছে এতে।

আফিসে নিয়ে গিয়ে যা দেখালো সায়েব, তাতে অভিভূত হয়ে খুরে দণ্ডবৎ করে এলাম। সারবন্দি ফাইল সাজানো, কাঁচা সেরেস্তা, পাকা সেরেস্তা। এতে আছে, নেপাল রাজ্যের কোন্ পাহাড়ের কোন গাঁয় যেতে ক'টা নদী, কোন জঙ্গল পেরুতে হয়।

কবার কোনদিকে মুখ ফিরোলে কতদূর পৌছে নাগাল মেলে, খবর সব। গাঁয়ের মাতব্বরদের নাম জাত বাসিন্দাদের গোত্র বর্ণ দিয়ে আদমসুমারি।

জাত মিলিয়ে ভর্তি হয় পল্টনে। ঠিক হকদারকে পেন্সন দিতে হবে, সঠিক খবর মিলিয়ে নেবার গরজেই খাড়া হয় সেরেস্তা। আশ-পাশের লোক ভর্তি হতে পেন্সন নিতে এলে, তাদের এজাহারে কাঁচা সেরেস্তা পাকা হবার পথ ধরে। নিদেন দশ বারোবার দশ বারোজনের জবানবন্দি মিলিয়ে কাঁচাটা পাকা হয়, ধন্য অধ্যবসায়। রাজাকে বলি—সরকার আপনার রাজ্য, সব গাঁয়ের সব লোকের নাম জাত গোত্র বর্ণ জানা নেই। মৌজার সঠিক অবস্থানও অজানা। তা বলতে পারে ওই বিদেশী রাজার জাত, এই গুণেই এরা পৃথিবী শাসন করে।

গোরখপুরে জাঁচাই করে কিনতে হবে, সুলক্ষণা সবৎসা নীরোগ চারটি কালো গরু, রাজভোগে দুধ যোগাবে।

যাবার বেলা চারজন সৎ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণান্ত করে দান করে যাবেন গরু চারটি। শুধু একবেলার ওয়াস্তা, খুঁজে পেতে হয়রানি কম নয়।

ষোল মাইল দূরের নদী হতে জল আসবে, ডাক বসাতে হচ্ছে। ঘড়া চারটি অফিসারের সামনে নদীতে ভরে, কব্জা দেওয়া ঢাক্‌নায় চাবি দিল। কাপড় ঢাকা মুখে শীলমোহর নিয়ে ঘড়া, বাঁকে উঠে চলে। ক্রোশ অন্তর ডাকের লোক বসেছে হাত বদল মানে কাঁধ বদল হতে হতে ছুটে এসে উপস্থিত—ইদম্ পানার্থ জলম্।

সাঙ্গোপাঙ্গোদের জলযোগে দু'মণ আটার পুরি, দেড় মণ তরকারী, দই মিষ্টি পরিমাণ মত, যোগানদার ময়রাকে ফরমাস্ করি। নাগরিক রইস্‌রা রাজাকে অভিনন্দন জানাবে, তার প্যাণ্ডাল দাঁড়ালো। তোড়জোড় মিলিয়ে দিয়ে, লোকলস্কর রেখে, আমি আগু

বাড়ি। রাজার স্পেশ্যাল মৈলানী আসছে ভোরবেলা, চা বিস্কুট ঠিক থাকবে। গৌরীফাঁটায় গাড়ি এলে, গুষ্ঠিশুদ্ধু সকলের আহারের ব্যবস্থা চাই। তারপর জঙ্গলে দশ ক্রোশ দূরে প্রথম ক্যাম্প মছলি-বাস। বড় হাকিম সব ঠিকঠাক করে মোকামে হাজির আছে। তবু একবার দেখে নিতে হয়, লক্ষ্ণৌ হয়ে মৌলানী যাচ্ছি।

লক্ষ্ণৌ নামী জায়গা। গোরখপুরে গাড়ি চাপি, যাত্রী আমরা দুটি, সঙ্গী নেপালী, ভারতীয় মিলিটারি। গাড়ি ছাড়বে, উঠে এল কেতা-দুরুস্ত মুসলমান যুবা, মালপত্তর তার গাড়িতেই ছিল। মাঝরাতে মিলিটারি নেমে যেতে, আলাপ জমাল যুবাটি আমাকে একলা পেয়ে।

—লক্ষ্ণৌএ কোথায় যাব, থাকব কোথায় ?

বলি—শহর দেখা, তা হোটেল থেকেই সারব।

বলল—যদি কিছু মনে না করেন তো, আমাব গরিবখানায় পায়ের ধুলো দিলে, আপনার খেদ্‌মতে দর্শনীয় সব দেখিয়ে কৃতার্থ হই। তোমার বহু হিন্দু বন্ধু আমার কাছে এসেছে।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। ছোক্‌রা ইন্‌জিনিয়ার, ছুটিতে বাড়ি যাবে। হৃদ্যতায় মোহিত করল। ওর বাড়িই যাব, যা থাকে কপালে, নূতনের মোহ পেয়ে বসে।

শেষরাত্রে গাড়ি ডালিগঞ্জ এল। বন্ধুটি বলে—তৈরী হোন, এর পরের স্টেশন সিটি, সেখানে নামব।

মন বিগ্‌ড়ে গেছে, ভাল হোল কী ? চারদিকে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা, কার মনে কি আছে, কে জানে ? তবে, এতটা অগ্রসর হয়ে, ফেরাও চলে না। শীতের রাত, চারদিক কুয়াশা ঢাকা।

এই সিটি স্টেশন, নেমে আসুন।

বলির পাঁঠার মত পিছু পিছু নেমে গিয়ে, একটা গাড়িতে বসলাম।

ছোক্‌রা নানা জায়গা দেখিয়ে, হরেকরকম বলছে। বাইরে ঘোর, মনে আঁধার, গাড়ির কোণ্‌টিতে আমার নির্বাক নিস্পৃহ অবস্থা।

এই আমিনাবাদ পেরোলো, গাড়ি একটা বড় বাড়ির প্রাঙ্গনে ঢুকছে, ঘরে ঘরে বন্ধ দরজার ফাঁকে আলোর রেখা দেখা যায়। ছোক্‌রা নেমে ধাক্কা দিতেই দোর খুলল, বেরিয়ে এল এক সুপুরুষ। আমাকে নামিয়ে নিয়ে হলের মাঝে সুসজ্জিত কৌচে বসিয়েছে, দু'দিকে আমার দশ বারোটি সুবেশ যুবা।

এই হয়েছে! রাস্তায় কখন তার করে থাকবে, শিকার নিয়ে ফিরছি, সব তৈরী হয়ে বসে আছে। না হোলে, শীতের রাত, এরা এখন সেজেগুজে বসে থাকবে কেন?

আর উদ্ধার নেই। প্রতি মুহূর্তে, আক্রমণ প্রতীক্ষা করে আড়ষ্ট চকিত বসে আছি।

ওরা নানা প্রশ্ন করে—রাস্তায় ঘুম হয়েছে তো, শীতে কষ্ট হয় নি তো?

ঘুমের কথাই বটে! শীত তো পেটে সেঁধিয়েছে, সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে, হঠাৎ দোস্ত এসে বলে—শয্যা তৈরি, বাকি রাতটুকু আরাম করুন।

লাফিয়ে উঠে চললাম, আর বিলম্ব নেই, মনে জল্লাদের হাত থেকে পালাবার আদিম প্রেরণা নিয়ে। কুঠুরিতে ঢুকে অবিলম্বে দোর এঁটেছি, ঘুরে ঘুরে খিড়কির সব ছিটকিনি লাগালাম। হাঁপ ছেড়ে তাকিয়ে দেখি, আলোকিত কক্ষে রম্যপালঙ্কে পরিপাটি শয্যা। লেসের ঝালর দেওয়া চাদর, মখমলের বালিশ, রেশমের বালাপোষ, সৌখিন বটে। হলই বা, হিংসা কি ভুলতে পারে, জাতের দোষ যে। আলো জ্বেলে রেখে, কোট ওভারকোট গায়, শয্যায় বসে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেরাই। বুকে দুরু দুরু কাঁপুনি, শোবার উপায়

নেই। সেরেছে রে! এ যে বাদ্যি বেজে উঠ্‌লো—ঝোঁই ঝোঁই ঝক ঝক ঝম্‌ আর বাঁচোয়া নেই, নির্ঘাৎ কোরবানি করবে। কেঁপে কেঁপে দুর্গা নাম স্মরণ করি।

দোর জানালা পাকা করেই এঁটেছি, মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি, চরম মুহূর্ত এই এল বা।

বাজনা দূরে চলে গেছে, সব চুপচাপ, মন কিন্তু প্রবোধ মানে না। এ আবার কী খেলা! ঘামছি, আর থেকে থেকে শিউরে উঠতে লাগলাম। কাক ডাকে, তবু বিভীষিকা কাটে না। বেশ বেলা করে দোর খুলে বেরিয়ে দেখি, বন্ধু আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সেলাম তমিজ মেজাজসরিফ করে গোসলখানা দেখিয়ে দিল।

চা খেতে দুজনায় চললাম হিন্দু হোটেলে। 'পাল এণ্ড সনস্‌' এই নিন হিন্দু হোটেল, চা টোস্ট চাওয়া হোল। ও হরি, ইয়া দাড়ি, দীন এলাহি ট্রে নিয়ে হাজির! এখানে এসব চলে।

দাম চুকিয়ে দিয়ে আমিনাবাদ পার্কের ওপারে ইমপেরিয়াল হোটেলে চা খেলাম।

আমাকে নিয়ে গেল লক্ষ্ণৌর পাত্তি জর্দা মার্কা খাঁ বাহাদুর আহাম্মদ হোসেন দিলদার হোসেনের সৌধে। বড়লোক বটে, মোগলাই কক্ষে খাঁ বাহাদুর স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। বন্ধু আমার কথা বলতেই উঠে এসে সাদরে করমর্দন তসলিমাৎ করে কক্ষান্তরে বসিয়ে 'গুপ্তগু' করলেন।

রমজানমাস আত্মীয় স্বজন মেলমোলাকাৎ করতে এসেছে। এইবার সব খোলসা হোল—ঈদ মবারক্‌ করতে বন্ধু বাড়ি এল, দিন উপোসী রাত্রে সব একত্রে খাবে। খবর পেয়ে আপ্তজন সব সেজেগুজে বন্ধুর-বাড়ি জুটেছে এসে। পেশাদার বাজিয়েরা বাজনা বাজিয়ে চলে—পুরবাসী ওঠো রাত ফুরোলো খেয়ে নাও দিনে তো রোজা।

তারপর আতরওয়ালা আসগর আলি মহম্মদ আলি। দেখলাম

সৌজন্যে এক একটি অবতার, বিরাট ধনী মানী আচার ব্যবহারে ধরার উপায় নেই। একে একে আমার বন্ধুর বাড়ি এসে আমার সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করে গেলেন। যব মিয়াকে এইসন্ দাড়ী, তব্ গাঁও গুল্‌জার। নুর নেই, বেনুর সে হজরতে সুরৎ বেবাক মাটি, বিলকুল ঝাপ্‌সা মেরে যায়। এস, সবে মিলে নুরের তোয়াজ করি। লক্ষ্ণৌর মহশুর আতর মোতিয়া, নুরের সেবায় লেগে আছে হামেশা। বাল্‌বর নাপিতেরা ছাঁট কাট্ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তবে নুর তুরুস্ত হয়।

ডগা ছুঁলেই মামলা ফরসা, জাত্নবলে সমস্যার সমাধান মগজে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হারামী আস্‌তুরা নুরের গোড়া কাটিল যবে, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার সেদিন থেকেই। পরের বোঝা ঘাড়ে চেপেছে, সিন্দবাদের ভূত নিয়ে আছি সব। গান্ধারী কেশর নিয়ে এসেছে ব্যাপারী, তিনটি উট বোঝাই দিয়ে। বিরিয়ানীর রং ধরাবে নয়ন-বিমোহন, মৃতুমন্দ খোস্‌বাই আনে খাদ্যে। আলাদর্জার এ চীজ, পড়ে থাকে কি নুরের দেশে, খান্ দানীরা লুফে নেবেই।

হায় রে আশা! ঠিকে ভুল, কেউ ফিরেও তাকাল না। দোকানি বেসাতি সাজিয়ে বসে প্রহর গোণে। ক্রমে ছয় ঋতু পার করে দিয়ে হতাশ চুঘ্‌তাই মাল নিয়ে মুল্লুকে ফিরে যাচ্ছে। নিরাশার দীর্ঘশ্বাসে মিশে উদগার বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে—জাফ্রান জানে না, নুরের বাহার দেখ! বন্দর ক্যাজানে আদিকে সবাদ। পোড়া কপাল, গমারকে বেহেস্তের গুল্ দিতে এলাম হয়রানির একশেষ শুধু অর্থদণ্ড নসিবে লেখা ছিল তাই হোল।

কথাটা নবাবের কানে উঠেছে—বর্বর বলে কি? এমন কি সে আজব সওদা, অযোধ্যার রইস্‌রা যার মর্যাদা বোঝে না? সওদাগরকে তলব হোল—কী এনেছো তুমি?

—জনাব খুদ্ ফক্কর, ইয়ে জাফ্রান। খোদাতালার তাজ্জব করামৎ,

ফাজিল লোকেরা বলে গুলরওসন্। পোলাউ-এ ছাড়ুন, সুর্‌খ্‌রওগন, খোসবু করে দিল্‌তর্‌র্‌।

—বলো কি হে, ঘাসের ফুল লোকে খায়? এতে নুরের ডগায় রং ধরানো চলে কেবল।

আহাসান্ আলি হাঁ, নুরের চোঁচ ছুঁয়ে চুমড়ি খায়—তাই তো, তাই তো।

—তা, মাল কতটা এনেছো তুমি?

—জী, কুল্লে তিন উটের বোঝা।

—ফেলো এই পুকুরে, দামটা খাজাঞ্চিখানায় যেয়ো, পাবে। নবাব বাগানে দরবার জমিয়েছেন, সামনে পুকুর। কেশরের ছোঁয়ায় জল জাফ্রানি হোল, মর্জি হোতে সভাসদ্‌রা নুরেব ডগা ডুবিয়ে রং ধরিয়ে নিচ্ছে।

—পুকুরের রং বাগান মাখলো, নাম থাকে 'কেশরবাগ'। মুসলিম সভ্যতার চরমোৎকর্ষ ওয়াজেদআলি সার লক্ষ্ণৌ, কেশরবাগ ইমাম-বাড়া ছত্তরমঞ্জিলে পূর্ব স্মৃতি বহন করে সুন্দর শহর।

মহারাজার সওয়ারি হয়েছে রাজ্যের পশ্চিম সীমানায়, নৈনি-তালের কাছে। তিন মাসের মেয়াদে তিনি বেরিয়েছেন। প্রজার এত্তেলা শুনবেন, অভাব অভিযোগের কিনারা হবে, আর সুযোগ মত বাঘ ভাল্লুক মেরে উৎপাত কমাবেন। বাছা বাছা আমলা ফয়লা লোক লস্কর সঙ্গে চলে হাজার কয়েক, আস্তানা গাড়লে শহর হয়ে ওঠে। ধোপা নাপিত মেথর, হেকিম বৈদ্য ডাকদর, ঢুলিডুলি মুদ্দফরাস, পুরুত দৈবজ্ঞ চাপরাস, যে যার মোতায়েন আছে।

গহন বন, দীর্ঘ শাল তরুর ফাঁকে ফাঁকে, কাতারে কাতারে হাজার তাঁবুর শহর বসেছে। রাস্তাঘাট পাঞ্চলাইটে আলোকিত শান্ত্রী পাহারা দিয়ে ফেরে, হাজার পল্টন করে কুচকাওয়াজ, তা শিকারের হাতিই আছে

হাজার খানেক। রাজা বেরুলে ঘোড়সওয়ার রিসল্লা, বল্লম উঁচিয়ে আগু পিছু নেয়। হাঁসপাতাল পালে রুগীর এলাজ, কোটালের আস্তানায় অপরাধের শুনানি। ডাকগাড়িতে চিঠি চাপাটি আসে যায়। বিশ পঁচিশ মাইল দূরের ডাকঘর থেকে। এক বাস হতে অন্য আবাসে যাবার মোটর ডজন ডজন তৈরী, আর গণ্ডাকয়েক মালটানা লরি, ডেরা সরলে বাক্স পেঁটরা তাঁবুতল্‌পি বয়। সাঁঝ সকালে বৈতালিকেরা কালোয়াতি করে, সপারিষদ রাজার কান ঝালাপালা করে। এদিকে কলকাতা থেকে আংরেজ ফটোগ্রাফার এসেছে, সায়েব মেম মিলে শিকারের চলচ্চিত্র নেবে। রসদ গুদাম মেপে মেপে এই পল্লীর নুন তেল জিরে মশলা, কচু আলু আদা পলাণ্ডু তণ্ডুল, হাতির খোরাক ঘোড়ার দানা জোগায় কাঁড়ি কাঁড়ি। জিন্‌সি ভাঁড়ার হালুইকরের সঙ্গে জোগান দেয়, রুগীর পথ্য হোমড়াচোমড়াদের জলযোগে ফলমূল দই মিষ্টি দুধ সরবৎ নিয়মিত, কোন গোল নেই।

এল বসন্ত, রাজা পঞ্চমীতে ‘বসন্ত শ্রবণ’ করেন।

বসন্তের আমেজে সেজেছে বনানী, তার মাঝে পত্রে পুষ্পে মণ্ডিত চন্দ্রাতপ। আলো করে বসে আছে সভাসদরা বাসন্তীরংয়ের কাপড় পরে।

রাজা এলেন। বিউগল্‌ আগমন ঘোষণা করতে ব্যাণ্ড সুর-লয়ে সেলামী বাজালো, সব দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন জানায়। পুরোহিত লাজাবীর পত্রে পুষ্পে ইষ্টদেবতাকে করলেন আবাহন। দেবতার সম্মুখে মৃদঙ্গ করতাল বাজে, জয়দেবের ‘ধীরসমীরে’ গীত হয়, ইতি ‘বসন্ত শ্রবণ’।

বিরাট মণ্ডপ উঠল, সরযূতীরে রাজা সহস্র গোদান করবেন। হোম-তপের সুরভিত ধোঁয়ায় বনস্থলী সুবাসিত, মন্ত্রকণ্ঠে উত্থিত হয় বেদধ্বনি। তার মাঝে, শিংএ সোনার তার প্যাঁচানো খুরে সোনার পাত মোড়া হাজার গাই দাঁড়াতে, পুষ্প বিল্বপত্তর পড়ল পায়।

হাজার বামুন জুটল এসে, পূজা দক্ষিণায় তুষ্ট তারা, হৃষ্টমনে এক একটি গরু নিয়ে সরে পড়ল, স্বুবর্ণমণ্ডিত ধেনু।

হাতি এসেছে, বুনোহাতি, ক্যাম্পে তুমুল সোরগোল, আর্তনাদ। কাপড়ের ঘরে বাস, ঐরাবৎ ছুটে পালালেও, দশ বিশটা ঘরের সবকটাকে থেঁতলে মাড়িয়ে যাবে। ওস্তাদ পাড়ায় লোকেরা চেঁচায় বেসুরো, পেটে খালি টিন লাঠিসোঁটা যা তা করে। ডাক্তার পাড়ায় হট্টগোল, আতঙ্কের ছোঁয়াচ লেগেছে। লোক চেঁচায় হাজারে হাজারে, সেপাই শান্ত্রীরা গুলি ছোঁড়ে এলোপাথারি। হাতিশালের লোকেরা মশাল নিয়ে তাড়া দিতে, হাতি পালাল।

এ মত্ত পাঁঠা, শিকারীদের হাতিশালে প্রায়ই মকুনিদের সঙ্গে দহরম করতে আসে। সফরের রাত্রি হয় দারুণ বিভীষিকাময়। হাতিটা সাঁঝেরবেলা শিকারক্লান্ত রাজার পথ আটকেছে, গহনবনে। অন্ধকারে দুষমন কখন কি করে, রাজা সে রাত্রে আর ফিরবেন না। হস্তিযূথ লোকলস্কর নিয়ে, শীতে ডেরার সন্ধানে বন ঢুঁড়ে পেলেন, গুটি চার পাঁচ ঘর সমেত এক থারুগাঁ। ডাকাত মনে করে, অধিবাসীরা গা ঢাকা দেয় বনের আঁধারে। অভুক্ত রাজা, রাজানুচরেরা বনবাস করলেন ওই ক'টি ঘরে।

হুকুম হোল—অদেখা আমার আশ্রয়দাতাকে হাজির কর, পুরস্কৃত করব।

সামনে পিছনে নেংটির পুচ্ছ ঝোলে, গায়ে আংরাখা, মাথায় টুপি, উঁচু দড়িবাঁধা খড়মে চড়ে, গেরস্থ দাঁড়াল রাজসকাশে।

বলি—পরমসৌভাগ্য তোমার, স্বয়ং মহারাজা তোমার ঘরে বাস করলেন।

—হ্যানা করেছে ভাগ্যের, কা ভাগ বা।

—কি প্রার্থনা আছে, বল সরকারে।

—কিছুমাত্র নেই।

—টাকাপয়সা জমিজিরেৎ ?

—কি হবে তা দিয়ে, মহাজন জমিদার নিয়ে নেয়।

ঋণ দেখায়, হিসেব করলে হয় সোয়াশো।

—আচ্ছা, এ টাকা দেওয়া যাচ্ছে।

—দেবে দাও—হাত পাতে, গুণে টাকাটা হাতে দিলাম।

—আর কি চাও ?

কিছু না, যেতে চায়।

রাজা তার বাড়ি পাকা বানিয়ে, জমি সব লাখেরাজ করে তাকে পুরস্কৃত করলেন। জানি না, সে তা গ্রহণ করেছে কি না, তার দরকারই ছিল না। পাকাবাড়ি করে স্থায়ী বাসিন্দে সে হয় না। ঘরে ভূত ঢুকে পড়ে, রাজার পেয়াদা খাজনা আদায়ে আসে, তখন উদ্ধারের একমাত্র উপায় বাস্তু ত্যাগ। বন ফুরিয়ে যায় নি, নূতন আবাদ পত্তন করতে তার লাগে কতক্ষণ।

রাতে বর্ষা, জংলীবর্ষা মুষলধারে নেমেছে। বাথানের চারধারে বেড়া। একমাত্র পথ, গর্ত খুঁড়ে ডালপালা সাজিয়ে উপরে ঘাসের চাপড়া দিয়ে সরেজমিন করা। হাতি কিন্তু টের পায়, ফাঁদে পড়ে না। শুঁড় দিয়ে ছুঁয়ে, গর্ত এড়িয়ে ঢুকে, মত্তামকুনির শুঁড়ে শুঁড়ে প্রেমালাপ হচ্ছে ধারাবর্ষণের আনুসঙ্গিকে। যুগপৎ গর্জে উঠল শতেক শতঘ্নী, আঁতকে পালাতে যাবে, করিবর আটকা পড়ল লুকোনো গহ্বরে। নড়বার শক্তি নেই, গর্জনই সার।

ছেলে তরাই জেলা-হাকিম, বাপ এসেছে পাহাড়ঘর হতে সওদাপাতি নিতে। নুন মশলা জামাজিরে পাহাড়ঘরে যা গরম, ছোঁয়া যায় না। ছ'মাস ন'মাসে একবার নামা হয়ে ওঠে না, সে যা বিকট রাস্তাঘাট। ছেলে ওজন মত মাল কিনে, চারজনা ভারির পিঠে চাপিয়ে পাঠাচ্ছে বাপের সঙ্গে। ডোকোঝুরি পিঠে চড়েই যাবে, বিকল্প সাধন কৈ ?

নদী থেকে খাড়া পাহাড় উঠল। গাঁয়ে কাঠের গজাল মেরে দীঘলকাঠ আটকেছে, সেই পথ। তারপর দড়ির ঝোলা পুল। মাঝ গঙ্গায় নাগরদোলা দোলাবে, তবে তো নদী পার।

যে সে ভারি নিয়ে পেরুবে, সে হয় না, অভিজ্ঞ শিল্পী চাই। ভারি ওই পাহাড়ী সেতু পথের ডন্‌জুয়ান, অবহেলে পারে চলে যায়। সামনে ছ'জন পিছনে ছ'জন, ভার নিয়ে মাথাগুঁজে যাচ্ছে। মাঝে ঘোড়ার পিঠে বুড়ো বাপ, তরাই জঙ্গল পথে পাহাড়ের দিকে এগুতে লাগল। জঙ্গল পেরিয়ে, ঘোড়া ছেড়ে, পাকদণ্ডি বেয়ে পাহাড়ে চড়বে।

বুড়ো গল্প বলে, ভারিরা শোনে, মাটির শোভা দেখে আর হুঁ হাঁ করে যাচ্ছে সব। ডোকোঝুরির ফিতে আট্‌কানো মাথা, তুললে পা চলে না। গল্প বেশ জমেছে, একি, এ যে হঠাৎ বিরতি। ছ'চারবার ফাঁকা হুঁ হাঁ করলে তারা, গল্প আর বেরোয় না। পিছনের জন মাথা তুলেছে, বাহন আছে, আরোহী নেই! ভূতুড়ে কাণ্ড, জল-জ্যান্ত মানুষটা উবে গেল নাকি!

দেখলে তো, জঙ্গলের রাজা রয়াল বেঙ্গল টাইগার, তরাইর বাঘ কী বাহাদুর! সারকাস্‌য়ালা এ কুদরৎ দেখাতে পারে না। রাস্তার এপাশ হতে মানুষটার টুঁটি ধরে নিয়ে, লাফিয়ে ওপাশে চলে গেল, শক্তি দেখ একবার! পায়ে সুন্দর প্যাড, শব্দ হোল না মোটে। লোকেরা টের পায় এমন কি, জানোয়ারটা পর্যন্ত সন্দেহ করল না, দিব্বি চলে যাচ্ছে।

কী সুন্দর চেহারা! চেকনাই ঝিলিক্ মারে। জেল্লা ঘুচাবে ময়লা? অসহ্য তা, তৎক্ষণাৎ চেটে সাফ করে গা, এমনই বাবু। সখের কথা শোনো। জঙ্গলে রাত বারোটায় মোটরে যেতে, বাঘ রাস্তা পেরুলো। কর্ণ বাহাদুর মিলিটারি ড্রাইভার আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই তখন বল্‌ল কথাটা

ডাকগাড়ি চালাই, সওয়ারি সময়, জঙ্গল পেরিয়ে পাঁচিশ মাইল

ডাকঘরে যাই আসি। ডাক নিয়ে ক্যাম্পে ফিরি রাত দশটায়। জঙ্গলে একটা জায়গা ঠিক আছে, গাড়ি এলেই হেড্‌লাইট ধরে সামনে চলে বাঘ। রোজ খানিকটা দৌড় করা তার সখ, পরোয়া করে না। চাপা দিলে, কি জানি গাড়ি বিগড়ে যায় যদি, আমিও কিছু বলি না। এইভাবে চল্‌ল, যে কদিন ও রাস্তায় এসেছি।

শিকারীরা সরকারী কর্মচারী। রাজার শিকারের বিলি ব্যবস্থা করে, কাজ গুছিয়ে দেয়। এই বিদ্যায় পাকা হাত, বাঘের আসা যাওয়া পথ চেনে। জলার ধারে মোষের বাচ্চা বেঁধে রেখেছে জায়গায় জায়গায়। রাত ফরসা হতে গাছে উঠে ঠাহর করে, কোন্‌টাকে বাঘে নিয়েছে, মাথায় মস্ত পাগড়ি বাঁধা। শুক্‌নো নালা ধরে সন্তর্পনে সন্ধান নেয়। কোন্ টোপ্‌টা কোথায় টেনে নিয়ে বাঘ কোন্ ঝোপে পড়ে ঝিমুচ্ছে। একবার বাঘ, শিকারীর পাগড়ি থাব্‌ড়ে নিয়ে লাফিয়ে নালা টপ্‌কে পালায়। পাগড়ি না থাকলে, মাথা যেত। আরামের সময় আনাগোনা। পছন্দ করে না কিনা।

লাফিয়ে শিকার ধরে, প্রথমেই ঘাড় মট্‌কে রক্তপান। তারপর মড়াটা টেনে এক ঝোপে ফেলে, অন্য একটা ঝোপে পড়ে ঝিমোয়। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখে নিচ্ছে, ছিঁচ্‌কেশেয়াল বুনো কুকুরে না খেয়ে ফেলে। গোঙ্গানিতেই চোর ব্যাটারা লেজ পিঠে তুলে পালাবে, তাই মাঝে মাঝে গোঙ্গাতে হয়।

শিকারী হাতি এসে বন ঘেরাও করে, শিকারীরা ক্যানেস্তারা পিটিয়ে, ঝোপঝাড় ঠেঙ্গিয়ে, শিকার গুটিয়ে আনে।

শিকার সব ঘেরায় পড়েছে, খবর পেয়ে রাজা এলেন। শিক্ষিত হাতিরা লেজ আর শুঁড় তুলে ঘেঁষে দাঁড়ায়। বাঘ ভাল্লুক লাফালাফি লাগাল, পালাবে তার ফাঁক নেই। রাজা অব্যর্থ লক্ষ্যে শিকার করেন পাঁচ ছ'টা বাঘ গুটিকয়েক শুয়োর ভালুক সম্বর হরিণ। হাতিরা শত্রু নিপাতে মজা পায়।

হাতির ঘেরায় বাঘ, তাক করে মারতে যাবেন, এক লাফে বাঘ হাতির শুঁড় কামড়ে ধরল। ধাক্কা সামলাতে না পেরে রাজা পড়লেন হাতির পিঠ হতে ভূঁয়ে, সাক্ষাৎ যমের মুখে। তড়িৎ গতি দল-বাহাদুর লাফিয়ে নেমে এক ঝট্‌কায় প্রভুকে তুলে দিল ওপরে, নিজে পরে উঠছে। চকিতে এত সব হবে, নোটিশ তো ছিল না। বাঘ বিশেষ কিছু করে উঠতে পারে নি, গুলির ঘায়ে প্রাণ দিল।

একবার বাঘ এক থাপ্পড়ে হাতির পিছনের সেরখানেক মাংস খুব্‌লে নিল, হাতি কিন্তু পালায় নি। রাজা নিজ হাতে হাতিকে আখ খাওয়াচ্ছেন, দিব্বি খাচ্ছে, ব্যথার কথা মনে নেই।

রাজার মর্জিই তো, উদ্ভট ব্যাপার। কে কোথায় বলে দিলে—বাঘের দুধে কি সব কি সারে, বাঘের দুধ-চাই। এ তো আর তোমার সুরভী গাই নয়, বাঁট ধরে টেনে নেবে দুইয়ে, পাবে কোথায়?

বাঘিনীর বাচ্চাগুলো ঘুরঘুর করে বেড়ায়, মাটা এক গুলি খেয়েই পড়ল এলিয়ে। হুকুম হোল ওর দুধ দুয়ে নাও, মরে ঠাণ্ডা হোলে, দুধ বেরোয় না। তড়িঘড়ি বাঁট টেনে দুইয়ে নিতে হবে।

বলিহারি বাহাদুরী ব্যাটার! সেপাইটা সঙ্গে সঙ্গে হাতির পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে বাঘের কাছে। চট্‌পট্ ছটাকখানেক দুধ টেনে নিয়ে উঠে এল, ওরাই পারে। এমনও তো হয়েছে, বাঘ গুলি খেয়ে নেতিয়ে পড়ল। দৈবাৎ ঘোর কেটে যেতে, যার নাগাল পায়, তাকে মরণ কামড়ে ভবপারে পাঠায়, উঠে জল খেতেও দিল না। তারপর নিজেও নিশ্চিন্দি, মরণের কোলে পড়ল ঢলে। যাবার বেলা যথালাভ।

হরিগোপালের অখণ্ডদা, বিজয়গোপাল করতো রেলে চাকুরি, রেল খালাস দেয়, বারাণসীর বাসিন্দেরাই চেয়েছিল হয়তো। এখন সে মস্ত ডাক্তার, তামাম দুনিয়া চেনে তাকে। পুঁইশাকের বীচি খুমীব-বাসীর সারায়, এ প্রয়োগ তো আর কেউ জানতো না। অখণ্ডদা

ভায়ের কাছে এল, ভয়ে ক্যাম্পের কেউ ও রাস্তা মাড়ায় না। পেলেই, নাড়ি ধরবে. এলাজ বাৎলাবে। অসুখ নেই বললেই কি ছাড়ে, চেহারায় দেখতে পাচ্ছে যে।

রাজার ডাক্তার কেশব কিছু জানে না, যুধিষ্ঠির সুপকারের ভীষণ কলিক। যন্ত্রণায় অস্থির, বেনারসী টের পেয়েছে। এসেই উঠিয়ে বসায়। জোড়াসনে সামনে বসে। দু'হাতে দু'হাতের নাড়ি টিপে ধরে, সেই যে চোখ বুজলো, আধঘণ্টা যায় তাকায় না, হাতও ছাড়ে না। রুগী যন্ত্রনায় কঁকিয়ে উঠছে, ডাক্তার নির্বিকার।

যাক্ এবার হাত ছেড়ে, চোখ মেলল—পেঁপে লেআও, পপিতা। কস্ খাওয়াতে হবে।

—ঘা হয়ে যাবে যে মুখে ?

—আরে, নেহি নেহি।

যা হোক, বাঁচা গেল, বাব্বা !

সওয়ারি ক্যাম্পে হাসি তামাসা চলে, বিশেষ যখন এমন ভাঁড় পাওয়া গেল। শুধুই ডাক্তার নাকি, বিজয়গোপাল জানে না এমন কী আছে জগতে ? সর্ব বিদ্যা বিশারদ এক কথায় গুলি খাওয়া বাঘ, বেঁচে গেলে ভীষণ চালাক হয়ে ওঠে। মোষের বাচ্চা মারে, ঘেরায় পড়ে না। ঘাড় মট্‌কে রক্ত খেয়ে পালায়। রাজা শুধোন বিজয়-গোপালকে—উপায় এর জানা আছে কিছু ?

বিলক্ষণ, সরকার একডেলা আফিম দিন। ময়দার গুলিতে পুরে ছেড়ে দিচ্ছি। বাঘ খাবে আর ঝিমোবে, যটা খুশি মারুন না তখন।

—এখন, বাঘকে আফিম খাওয়াতে যায় কে, তোমাকেই পাঠাতে হচ্ছে।

সে বিজয়গোপাল যাবে না। নুক্‌সা বাৎলে দেব, আবার আমাকেই পাঠাবেন, সে কি হয় ?

শিকারে গিয়ে রাজা ধরে এনেছেন, অজগরের বাচ্চা। তাঁবুর

কোণটিতে বোয়াবন্দি করে রেখেছেন। একপাশে গা দেখা যায়, নানা রংএ নকসাকাটা। সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে বিজয়গোপালকে দেখিয়ে রাজা বলেন—এটা তপস্যা ক্ষেত্র, জান নিশ্চয়। জঙ্গলে পড়েছিল, দেখ, কোন দেবতা নয় তো?

—উত্তম, দেবতা নয়, বলেন কী! সাক্ষাৎ নারায়ণ।

পদ্মাসনে বসে, চোখ বুজে স্তব আরম্ভ করে দিল। এদিকে থলের মুখ খুলে দিতেই, অজগর সোঁ করে, মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আর দেখতে নেই, পুজুরি 'ও বাবা গো' বলে 'ন দোই গার' ছুটে পালিয়েছে।

বিরাট বিরাট অজগর আছে জঙ্গলে, কি চমৎকার নক্সাকাটা দাগ। কাঠেরগুঁড়ির মত বিশাল বপু নিয়ে পড়ে থাকে। চোখের দৃষ্টিতে সম্মোহিত করে টেনে এনে, বনের পশু আহার করে ছ'মাসে ন'মাসে একটা।

গণ্ডার দল বেঁধে থাকে, কাঁটাগাছ খায়, পাঁকে গড়ায়। মারা পড়ে একটা দোষেই, জন্মে যেখানে খালাস হোল, সেখানে ছাড়া অন্যত্র মল ত্যাগ করবে না। গা তো ঢাল, গুলি, পয়সার মত চেপ্টে যায়। কান ঘেঁষে গুলি করে মারতে হয়।

গণ্ডার মারা পড়েছে।

বিধান মত রক্তস্নাত রাজা গণ্ডারের পেটে ঢুকলেন গিয়ে। পিতৃলোকের তর্পণ হয় শোনিতাঞ্জলিতে, রোলকল করে যার যা ভাগ দিয়ে দিলেন আলাদা আলাদা। আব্রহ্মস্তম্ব প্রজা জনের, যারা পরপারে, সমস্তটার ভাগে পড়ল কুল্লে এক গণ্ডুষমাত্র। মতলব বটে একটা, বাৎলেছে সুমিত্রানন্দন। জনে জনে হতে হলে গণ্ডারে টান পড়ে। তবু তো তারা যৎকিঞ্চিৎ যা হোক পেল, পরে যারা যায় তারা তা'ও পায় না। ইতরবিশেষ করা গণতন্ত্রে মানা, সাবেক ব্যবস্থা বাতিল হতে, রক্ত হয় জল। তবে বরাদ্দ অঢেল, যার যথা তৃপ্তি টান্নুক

গিয়ে, অকুলান হবার নয় কর্ণালী কুশী গণ্ডকী মাতৃক এ মুলুকে। তাবৎ ক্রিয়াকাণ্ড অন্তে নাকের ডগায় খাড়া খড়্গা কেটে রাখা হয়েছে। 'বহোৎ কিম্‌তি' নাকি এটা, কিসে কেন জানি না। খুর সমেত চারটে গোদা পা, বৈঠকের চার কোণে চারটা ফুলদানি সামলাবে, কাজেই কাটা পড়ে। ছাল ছাড়িয়ে ঢাল হোল। তীর বর্শার খোঁচা বাঁচাত আগে, বর্তমানে বর্ম চর্ম্মে সজ্জিত বীর, নকসা নাটকের বাইরে বড় একটা চোখে পড়ে না। গুলি ইস্পাতের মোটা পাতই ভেদ করে যায়, তাতে আবার ঢাল, বেকার মোসাহেবের মত, বড়লোকের বৈঠকে শোভা বাড়ায় শুধু।

এবার 'পিপা', ভারবাহী সহস্র জওয়ান ভিড় করে এসেছে, ধড়টা তারাই পায়। পুড়িয়ে খেয়েই করে বেবাক কাবার, রেঁধে খাবার তর সয় না। তন্ত্র মন্ত্রে সিদ্ধ তেজস্ক্রিয় বস্তু, কুলী কামিনের দুর্বল অস্ত্র রাখতে নারে ধরে, বেরিয়ে এল তোড়ে। মরা 'গেঁড়া' তাড়া করতে, কলেরায় গণ্ডায় গণ্ডায় মরতে লাগল। ভাবগতিক ভাল নয় দেখে, রাজা রাজধানীর দিকে পা বাড়ান। তবে ভাবনার কিছু নেই, বংশ লোপ হবে না, সুদূর চিতবন থেকে জোড়া গেঁড়া এনে রাখা আছে। কিছু হুকুমের বান্দা নয়, ঐ পর্বত শিখরে চড়ে কিসে কেন এল, সে এক রহস্য। যাক্, লোক সাধারণ তাদের হাঁপানিতে অব্যর্থ 'গেণ্ডুয়েকীপানি' জ্যাতে ধরুক গিয়ে। তবে, তুড় তুড় পীড় পীড় কখন ঝরে, সতর্ক হতে হবে বৈকি।

গুলির ঘায়ে মাও কাৎ, বাচ্চাটা মাকে ছেড়ে যায় না, ধরতে গেলে দে ছুট। ফিরে এসে মার দুধ খোঁজে, অবোধ শিশু বলে কাকে। তিন দিন পর বাচ্চাটা ধরা পড়তে, কাঠের খাঁচা করে নিয়ে এল সদরে। ধিতালবুড়োর বাধ্য, সেই হাতে করে খাওয়ায় কাঁটা গাছ। গুড় পেলে বেজায় খুশি, হাত চাট্‌তে এগিয়ে এল। তবেই হয়েছে! এক চাটনেই হাত সাফ, জিবে করাতের ধার।

বড় হয়ে ওঠে। সাগর পার হয়ে গাঁহাক আসে, দাম দিচ্ছে ত্রিশ হাজার বত্রিশ হাজার, জ্যুতে রাখবে। খাঁচায় থাকে, সে তার মর্জি, মনে করলে এক ধাক্কায় ঠেলে ফেলে চলে যেতে পারে।

সকালে খবর পেলাম, গণ্ডার পালিয়েছে। জঙ্গল তো বহুদূর, যাবে কোথায় ? ঘাড় ফেরে না, ঘুরুতে গেলে পাক মারে। খাঁচা যে মুখো ভেঙ্গেছে, সেই মুখোই এগুচ্ছে, সোজা পুবপানে, খানাখন্দ আট্‌কায় না তাকে।

ধিতালবুড়ো লোকলস্কর নিয়ে চল্‌ল, পায়ের ছাপ ধরে। সে লুকোবার নয়, যেমন হাতির গোদা পায়ের ছাপ। বাছা রাতে বেরিয়েছে, চলে চলে রাত কাবার। গাঁয়ের পাশে যাচ্ছে। লোকেরা আঁৎকে পালাল, মেয়েরা মূর্চ্ছা গেল, গরু মোষ ছোটাছুটি লাগিয়েছে। ভ্রূক্ষেপ নেই, এগিয়ে চলে।

ক্রোশ পাঁচেক চলার পর, ধিতালবুড়ো এবার কানের নাগাল পায়, হাসিমস্করা হয়ে থাকলে, জানি না। কান টেনে ফিরিয়ে দিতে উল্টো মুখো চলতে লেগেছে। এ তো আর টানাহ্যাঁচ্‌ড়া চলে না, নিরেট যে! আপনমনে চলে আসা পথ ধরেই ঘরে ফিরছে। যেটুকু যা হোল, নিছক প্রমোদ ভ্রমণ, প্রাণ চেয়েছিল।

খাটালে গেরস্তের গোয়ালে মোষ ঢুকে বসে আছে, দেখেছ। আর ঐ ছ্যাখো, জঙ্গলের পাশে ফাঁকা মাঠে দল বেঁধে ঘাস খাচ্ছে ওরা কারা ? বুনো মোষ, ভীষণ জীব কালোদৈত্য এক একটি। বাঘ পর্যন্ত এদের সেলাম করে, তফাতে যায়, ঘাঁটাতে সাহস করে না। বাঘ দেখলেই, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবগুলো শিং উঁচিয়ে রইল। বাচ্চা আর বুড়োরা মাঝখানে আছে। এ চক্রব্যূহ ভেদ করে শিকার বাঘের হিম্মতে কুলোয় না, সরে যায়। অবশ্য অতর্কিতে দলছাড়া চ্যাংড়াবুড়ো যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না, তা ও নয়। শিকারী দেখলেই ধারালো শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে ঢাউস মাথা গুঁজে, নাকে ফোঁস-

ফোঁসানি আওয়াজ। গুলির ঘায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটো হয়ে,যায়।

রাজধানী ফেরার পথে অমলেখগঞ্জে ক্যাম্প।

সম্মুখ সমরে তরবারি ঘুরিয়ে তক্‌মা দলপতিই পাবেন, তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ। এখন জাহাজে কাপ্তেন, পল্টনে সেনাপতি সর্বাগ্রে চলে না। লোকলস্কর চালিয়ে মোহ্‌রা নেয়, পরে নড়ে বাহবা কুড়োয়, অনুচরেরা যথারীতি সদর মোকাম মুখো এগিয়ে গেল, নিতান্ত নিজস্ব গোনাগুন্তি লোক নিয়ে রাজা ছদিন বিশ্রাম নিচ্ছেন, পরে যাবেন। প্রকৃতি ফাঁক মোটে পছন্দ করে না, মানুষ অবসর অপচ্ছন্দ করে, কাজ না জুটলে একান্তে পেসেন্স খেলতে বসে গেল। কি আর করা যায় চারকোশেরঝারি ঝোরা হউক। জানা কথা বীরগঞ্জ রেলওয়ের গাড়ি চলে, দিল্লিওয়ালা ঠিকেদার ইন্দ্রজিৎ ন'শো আরাকসি বসিয়েছে স্লিপার অপারেশন, দাসত্ব মোচনে মুক্ত অমলেখ্‌দের বসবাসের প্রস্তুতি। বাঘ ভালুক বড় একটা চোখে পড়ে না, হতভাগা একটা দল ছাড়া বাঘ মারা যায়।

আচ্ছা, আলোর গতি তো বলে সেকেণ্ডে ছ'লাখ মাইল, বাঘের গতি কেমন, বাঘ লাফাতে গুলি যাচ্ছে, বিঁধবে তাকে। সেকেণ্ড ছ'হাজার ভাগ করে তার এক ভাগ সাটারস্পিডে, উল্লম্ফমান বাঘ, ত্বরিৎ গতি বুলেট্ ছবিতে ধরা আছে, বাহাদুর ফটোগ্রাফার। তারপর ধরা পড়ে ভালুক পরিবার, স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা তিনটি। মাউজার ধেড়েটাকে ঘায়েল করতে উঠল উচ্চৈঃ কলরোল, ঋক্ষ রোদন মানুষের আর্তবিলাপকে হার মানায়। হাতি বোধ হয় এত উদাত্ত ক্রন্দনে অভ্যস্ত নয়, মুহুর্মুহু ব্রিংহিত তুলে, মাহুতকে ঝেড়ে, পুচ্ছ বাগিয়ে দিশেহারা, দিগ্‌বিদিকে ছুট দিল।

জঙ্গলে নিচু ডালে হাওদা আটকে আরোহী পিষে যাবার ষোল আনা সম্ভাবনা আছে। হাতি আপন শরীর মাপে, হাওদার উচাই তার হিসাবের বাইরে থেকে যায়। রাজা প্রত্যুৎপন্নমতি, একটা ডাল

ধরে লট্‌কে রইলেন। ভাগ্যিস্ ঝুলেছিলেন! খানিক যেতে ডালে লাগে, হাওদা চুরমার করে। হাতি ধেয়ে এগিয়ে গেল। রাজা দোল খান, বীরগঞ্জের বড় হাকিম স্থূল তনু, গেণ্ডুয়ার মত হাওদার খোলে গড়াগড়ি যান। পরিবারের হাতের নোয়ার জোর বলতে হবে, জ্ঞান হারালেন, প্রচুর গা ঘামালেন হালুয়া হলেন না মোটে। সে হাতি ফাঁকায় ছুটে গিয়েছিল। আমার সামনে দু'কান মোলে বলেন —বড়লোকের শিকারে মানুষ কদাপি যেয়ো না, যা শিক্ষা হোল। তাও বলি, বাছা মোহন প্রসাদ, আজ না হয় খেদায় ধরা পড়ে রাজার পেয়ারের হাতি হয়েছ। জন্মে অবধি জঙ্গলেই তো ছিলে, কখন ভালুক কাঁদলো না?

জঙ্গলের নাইটদের দেখোনিতো, দেখবে চল।

হৈ হৈ রৈ রৈ, বাঘ বরাহে দ্বন্দ, তামাসা দেখবে, লোক যাচ্ছে লাল ঝারি। গভীর জঙ্গলে বেশ খানিকটা ফাঁকা ময়দান, যুধীরা সেই আখড়া বেছে নিল। আম্‌পায়ারেরা যে যার গাছে চড়ে, অমন দু'শো লোক, শাখা মৃগের আসনে বসেছে। আসছে যাচ্ছে ছুটছে পড়ছে, মল্লেরা ফিরেও তাকায় না। যে যার কোটে তদ্‌গত চিত্তে দাও প্যাঁচ কষে। কখন লাফিয়ে ছুটে মাঠের মাঝে পড়ে, এ ওর'পর ঝেড়ে এল। বেশ খানিকটা হুটোপাটি ছেড়াছেড়ি হয়ে ফিরে এসে মিটিমিটি তাকায়, হাঁপ ছাড়ে। এ ক্রম বজায় ছিল পাঁচদিন কেউ কাউকে ছাড়ে নি। শেষমেষ শুয়োরটা বাঘের পেট ফেড়ে পরপারে পাঠিয়ে বনে ঢুকল, ক্লান্তবীর বিশ্রাম চায়! একদিন খিদে তেষ্টা মেটেনি, চোখে পলক ছিল না, হরদম পাঁয়তাড়া ভেঁজেই কেটেছে। ঝগড়াটা বাধে বয়সের ছোট বড়, দাদা বলা নিয়ে। এ কেমন বিচার বল, দাদা বলবে যে ভাই তাকেই ঠাণ্ডা করে বচসার জের মেটাতে হবে? সৃষ্টির আদি থেকেই এ ফ্যাকড়া চলে আসছে, বড়র মান্য যাবে কোথায়?

বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ একবার হয়েছিল ত্রেতায়, আর বাধলো পশুপতি-থানে সেদিন। রাজার কাছে নিষ্পত্তির আশা নেই জেনে নিজেরাই লড়ে ভিঁড়ে হেস্তনেস্ত করে ফেলছে।

এপারে পশুপতি ওপারে গুহ্যেশ্বরী পাহাড়, মাঝে বাগমতির আর-পার পোল। হাজার খানেক বাঁদর এপারে, ওদিকেও সেইমত, দারুণ কিচিমিচি মুখভ্যাংচানি, আসর গুলজার। পশ্চিমেরা বাচ্চাটাকে নাকানি চুবানি দিচ্ছে, অনধিকার প্রবেশের সাজা। অমনি পুবপেড়ে মুখখিস্তি হৈ হল্লা তুলে তেড়ে এল, কিবা মুখ ভঙ্গি, কি বাগবিস্তার। এগিয়ে এসে, পোলের মাঝে তুই দলে ভিঁড়ে ঝটাপট মারামারি হয়ে গেল। আবার ওরা হটে আপন টিলেয় উঠে, এরা আর্যাঘাট সিঁড়ির ওপর লাইনবন্দি দাঁড়াল। এই করে ঘণ্টা অনেক যুঝেছিল তারা, বহুজন নিখরচায় মজা দেখে।

বাচ্চাটাকে আধমরা করে ছাড়ে। ফেরৎ পেয়ে পুবপেড়েরা খুশির জিকির দিয়ে ওকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। বিবাদ মিটেছে, আর যেন ছোট বড় কেউ, বাঁদরামো করতে পরের সরহদ্দ না মাড়ায়। ধরা পড়লে যা হোল, তাই হবে।

রাজা শিকারে বেরিয়েছেন। ক্যাম্পের সব তো সবদিন শিকার দেখতে যায় না, বৈঠক তাঁবুতে বসে মজলিসি গল্প চলে, তুপুর বেলা। মাইলা গুরুজী বলছেন— আমার তাঁবুতে চল, বেনারেস থেকে পান মেঠাই এসেছে, খাওয়াব।

তিনজন আমরা তাঁর তাঁবুতে এসেছি। পরিষ্কার রোদ, রোদে বসে মেঠাই পান খেতে খেতে চলে গল্প। আজ ছ'টা গ্রহ একত্র হয়েছে, গুরুজি তাঁর পাঁজি পুঁথি মেলে ফল বাৎলান—মহামারী মহাপ্লাবন প্রলয়-ঝঞ্ঝা আরও কত কি। অবশেষে ভূপ্রকম্প চ মহৎ ভবেৎ।

বিপুলা চ পৃথ্বীর তিনভাগ জল, বাকি এক ভাগের কতটুকুই বা মানুষের বাস। কোথায় কোন্ গ্রহ মিলে কি ঘটায়, কে তার খোঁজ

রেখেছে। রোদে বসে পান চিবুই। হঠাৎ মাটি কেঁপে উঠল—দেখ্ দেখ্ বাজে ক'টা, জল আন্ এক বাটি। দুটো বিশ, জল বারো মিনিট কাঁপল। ১৯৩৪ সালের প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প। নেপাল বিহার ধ্বংস হয়, পশ্চিম মুলুকে কেউ টের পায়, কেউ বা পায় না। রাজা হাতির পিঠে চড়ে বাঘ শিকারে রত, তিনি জানেন না।

ক্যাম্পে দুশ্চিন্তার ছায়া নামে, রাজধানীর ডাক চারদিন বন্ধ। খবরের কাগজ জানায়—উত্তর বিহারে বহু শহর বিধ্বস্ত, নেপাল পৃথিবীর বুকে মুছে গেছে, খবর নেই। রেলপোল ছিন্নবিচ্ছিন্ন, জমি ফেটে প্রচুর জল বালি বেরুতে, মাঘমাসেই বন্যা এসে গেল। রাস্তা ঘাট এবড়ো খেবড়ো, যাতায়াত কষ্টসাধ্য। অহর্নিশি কম্পন, কখন বেশী কখন কম, লোকের প্রাণ যায় উড়ে, প্রলয় সমাগত। পঞ্চম দিনের সংবাদ, কাঠমাণ্ডু উপত্যকার বিষম ক্ষতি হয়েছে। বাড়ি ঘর পড়ে শহরের রাস্তা বন্ধ, চারদিকে ধুলোয় ধুলোময়। কত মরেছে, কতলোক ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে, জমি হাঁ হয়ে করে বহুজীব গ্রাস। লোকেরা ময়দানে আশ্রয় নিল। রাজ পরিবার রাজপুরুষ সৈন্যসামন্ত সহ আহার নিদ্রা ভুলেছে। অহোরাত্র উদ্ধার কার্য চালিয়ে বহুলোকের প্রাণরক্ষা হয়, কত হারানো শিশু বাপ মা ফিরে পেল। পাহারার কড়া বন্দোবস্ত, বস্তুজাত টাকা কড়ি নড়চড় হয় না, কেউ তো ঘরে নেই, সবই অরক্ষিত। ডাক্তার বৈদ্য অহর্নিশি হাজির, কত ধনুষ্টঙ্কার নিউমোনিয়ার রুগী বেঁচে উঠেছে। নেপালের বরফ পড়া শীত, গৃহহারারা মাঠে থাকে পড়ে, অনেকে আবার ইট পাথরের ঘায় আহত। লক্ষলোকের অন্নপথ্য জুগিয়ে, হাজার মৃতদেহ সৎকার করে, শত শত রুগীকে ঔষধ উপাচার দিতে সরকার দুর্দৈবের সম্মুখীন। অতুলনীয় কুশলতা অমিত সাহস, অপরের সাহায্যের দরকার নেই। পরের মুখাপেক্ষী হবে না, লাখ বেলাখ যা লাগে দেশবাসীকে দিয়ে, দু'বছরেই গোটা রাজধানী মায় শহরতলী

আগের চেয়ে ভাল করে গড়ে তুলল, ক্ষতের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট নেই। এই আত্মবিশ্বাসের জোরেই এরা অজেয়।

যাকে বলে মহাযজ্ঞ। হাজারে হাজারে লোক মরে, অপমৃত্যু ঘটায় ভূমিকম্প, আত্মার তৃপ্তির জন্য কোটি হোম। বলি, একটা হোম করতেই তোড়জোড়ের অন্ত নেই, তার কোটি হোম, রাজসূয় ব্যাপার। বিশাল মণ্ডপে, হাজার ঋত্বিক বেদমন্ত্র পাঠে রত, নানা মুদ্রা সহ। ঘড়ায় ঘড়ায় ঘী পড়ল আগুণে, পুড়ছে রাশি রাশি তিল যব। মহোল্লাসে উদ্দীপ্ত হচ্ছেন কৃষ্ণাবর্ত। পাবন মন্ত্রপূত ধূমে মিশে, পতিত আত্মা বিশুদ্ধ বিমুক্ত হয়ে উর্ধ্বলোকে উঠে গেল, সন্দেহ কি ? যার যা বিশ্বাস, তদ্রূপ সিদ্ধি তাকে পেতেই হবে।

এ হোল প্রজার কল্যাণে, নিজেরও তো কিছু চাই। রাজারানী দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন হন সোনা দিয়ে। মোণ পাঁচেক খাঁটি সোনা তোলায় তোলায় গরিবদের বিলিয়ে দেওয়া হোল, এটা সুবর্ণ তুলা।

রাজরানীর সর্বাঙ্গে ব্যথা। ঝাড়ফুঁক ধুলোমূলো ওষুধপত্রে কমে না গতর চূর্ণ করে দিচ্ছে। সিমলায় থাকে এরিকা বিদেশিনী, দলাই মলাই করে ব্যথা বিষ সারায়। পাক্কাহাত, নামডাকও বেশ। রাজা রাজড়ার দরবারে ডাক পড়ে হামেশাই। কখন যায় মাইশোর, কখন বা ত্রাবাংকোর, সে এল নেপালে। রানীর চেয়ে রাজাকেই পায় বিষম কাহিল। গায়ের ব্যথা, আজ না হয় কাল কমবে, মনঃ কষ্ট মানসিক ব্যাধি, কুরে কুরে খায়। সমবেদনায় রাজার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। গোমড়ামুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে, দুঃখের অশ্রু বজ বজ বেরোয়। নৃপতি বলেন—আমার মরণদশা বন্দীরও অধম। তার বন্ধন দশা লোকে দেখে, সহানুভূতি জানায়, আমাকে অপমানে দগ্ধে মারে। নামে মাত্র আমি রাজা, কাণাকড়ির এখ্তিয়ার নেই। যা করে ওই

প্রাইমমিনিস্টার। তার ওপর কারও কথা চলে না, অথচ আমি নাকি সর্বেসর্বা নরাধীপ নারায়ণ। লোকে ভাবে আমার দর্শন পেলে, সারা বছরের পাপ খণ্ডায়। আমাকে শিখণ্ডি খাড়া করে, আমার নামে স্বেচ্ছাচার চালাবে, বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। এর বাড়া পরিহাস কল্পনা করতে পার?

শ্বেতাঙ্গিনী উঠে পড়ে লেগেছে, চক্রব্যূহ ভেদ করে রাজাকে সে উদ্ধার করবেই। দূতাবাসে আনাগোনা লাগাল। রানার বন্ধু কূটনীতি বিশারদ ইংরেজ, স্বজাত তো, হাড়ে হাড়ে চেনে। সহজে কব্জে দেবে না, ওদিকে না ঘেঁষাই ভাল। রাজনীতির নতুনপাঠ পড়ছে ভারত, সহজেই ভজিয়ে ফেলে, রাজদূত যে কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত। একবার মেলমোলাকাৎ দরকার, প্ল্যানটা খোলসা হয়। ছেলের বাড়ি শহরের উপকণ্ঠে নিরিবিলি। সাঁঝের আঁধারে বাগানে একা বসে রাজা বেয়ালা বাজাচ্ছেন। রানারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে পেছনের দেওয়াল টপ্‌কে হিন্দরাজদূত এসে জুট্‌লো, শলাসরাকৎ হবে।

রাজা বলেন—খোদ মোরব্বির হাতে লেখা খৎ না পেলে, রানার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার হিম্মৎ আমার নেই।

তাই আচ্ছা—দূত গেল দিল্লী, ঈপ্সিত দলিল নিয়ে এসেছে। এ তো আর যে সে কাগজ নয়, যে যার তার হাতে চালান দেওয়া চলে, খুদ্‌ দূতকেই রাজার হাতে দিতে হবে গোপনে।

ছলনায় রমণী সরেস। এরিকার ব্যবস্থা, রাজদূত দেওয়ানীখাসের শোভা দেখে চোখ জুড়োবে, আর্জি পেশ করল রাজরক্ষী মনসবদার রানার কাছে। অনিচ্ছায় হলেও অদবের লিহাজে অর্জ্‌ মঞ্জুর হয়ে দূত রাজবাড়ি এল। সৌজন্যের আছিলায় নরেশ স্বয়ং মেহমানকে এ ঘর সে ঘর নিয়ে বেড়ান। তাক্‌ মত কুহকিনী খৎখানা, দূতের হাত থেকে রাজার হাতে ঠেকিয়ে দিয়ে হাত সাফাই করেছে, কখন কে জানে।

আশ্বাস পেয়ে রাজা বল পান, এখন সুযোগের অপেক্ষা।

পুরাণে আছে প্রজাপতির কাছে বন কেঁদে পড়ে—প্রভু রক্ষা কর, সবংশে নিপাত হলাম। বনে লোহা ঢুকে গাছ কাটে কটাকট্। সাবাড় করে দিল সব।

ব্রহ্মা হেসে বলে—সাধ্য কী লোহার, বন শেষ করে, মাভৈ।

—আজ্ঞে কাঠের দুষমন হয়ে কাঠ এলো যে, কড়ুলের বাঁট কাঠের।

—তবে তো ভাবনার কথা হোল, পদ্মযোনি চিন্তা করতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রীর বংশ, রানাবাংশ ঝাড়ে পাতে বেড়ে উঠতে, সৃষ্টি হোল বর্ণশঙ্কর। বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি, কারো ছোঁয়া কেউ খাবে না। রোলপ্রমোশন সব পাটরাণীর ছেলেদের, তারাই পর পর সর্বেসর্বা প্রাইমমিনিস্টার হতে থাকল। সুয়োরাণী দুয়োরাণীর ব্যাটারা ছোট হয়েই থেকে যাবে, এটা অসহ্য, আত্মকলহ শুরু হয়েছে। প্রাইমমিনিস্টার যুদ্ধ তাদের রাজধানী থেকে সরিয়ে, নানা জায়গায় নানা কাজে লাগাতে, ভারতে বসে গোপনে তারা রানা প্রাইম-মিনিস্টার উচ্ছেদের সঙ্কল্প নিল। সুযোগ বুঝে পরচক্রীরাও যোগ দেয়। বিবাদ জিইয়ে রাখবে। রাজা দেখেন এই সুযোগ, দেখি, হৃতসম্মান ফিরিয়ে আনা যায় কিনা।

একদিন সকালে চড়ুইভাতির নামে পুরী থেকে বেরিয়ে ঢোকেন গিয়ে ভারতীয় দূতাবাসে। তল্পিতল্পা ভারিই ছিল, ভারতের প্লেনে উড়ে গিয়ে দিল্লিতে বাসা বাঁধলেন।

অরাজকতা বাঘ হতে ভয়ঙ্কর, প্রজারা ডরায়।

রাজাতো দিল্লী চলে গেলেন, স্তম্ভিত রানা অন্তর টিপুনিতে অতিষ্ঠ। সীমাপারে হানাদারে গাড়ি চড়ে আসে, এদের আবার ওপথে চলা মানা। পাঁচশো মাইল লম্বা সীমানা, এই বাগজ্ঞানদের সামনা সামনি করতে হবে। রাজ্যের রাস্তাঘাটের যা দুরাবস্থা, সৈন্য পাঠানো সহজ নয়। পশ্চিমপ্রান্তে বড় হাকিম মহীকর হানাদার

রুখতে গিয়ে প্রাণ দিল। পূর্বপ্রান্ত মোরং-এ মনসবদার রানা তাদের মোকাবিলায় বিপদগ্রস্থ, গুলি খেয়ে ছেলে মরে। রানাব সীমিত সাধন, বড়তরফ পরোক্ষ সাহায্যপুষ্ট।

খবর আসে সহায়ক সেনা আসছে। সেও তো পঁচিশ ক্রোশের ধাক্কা পাহাড় গড় থেকে নেই-পথকে পথ করে। প্রান্তর পারে নদী, কুশী পেরোয় কিসে? চোরাগোপ্তাগুলিতে, মাঝগঙ্গায় এক কিস্তি ভরা-ডুবি হতে, মাল্লারা মায় তরণী উধাও। কারনী এখন তখন বৈদ্য মধুপুর।

মধ্যপ্রান্ত মোহ তারিতে বড় হাকিম তিলক, চৌহদ্দির চারধারে গড়খাই খোঁড়ালেন। মিলিটারিতে কর্ণেইল ছিলেন কিনা, কেরামতি ফলাবার মৌকা এ বটে! গলায় গুলির মালা, হাতে রাইফেল, কোমরে পিস্তল। অষ্টপ্রহর টহল লাগান, খানায় জোয়ানদের হাঁক পাড়েন—হুঁসিয়ার হো। কেন বাওয়া, পৈত্রিক প্রাণটা দেওয়া? সরকারের সম্পত্তি যায়, আবার আসে, গোঁয়ার্তুমিতে তোমারটা গুমোলে, আর হবে কি?

বীরগঞ্জে বিরাট লুট। বেশীর ভাগ যে যা পারে নিয়েছে, বাকি পঞ্চাশ লাখ প্লেনে দিল্লি যাচ্ছিল, ধরা পড়ল। অনুরূপ অন্যান্য জায়গায়, চালাকেরা ত্রানাদেব সঙ্গে মিলে, লুটের মোটা ভাগ নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। হানাদাবে লুঠে, ঠেকানো গেল না, বলবে কি বল? জেলার ভার ওঠাবার সময়, হরিবংশ মাথায় তামাতুলসি হাতে শপথবাক্য পাঠ করেছে—নিমেককো সোঝো চিতাউনেছু—সরকারের নুন খেয়ে গুণগান করিব। তা, গুণ ইস্তক নাগাদ গেয়েছে, সুবিধে মত নিজেরটাও গুছিয়ে নিচ্ছে। একেই বলে পাটোয়ারি বুদ্ধি।

জিলা সদরগুলি সীমানা বরাবর বসানো। আক্রমণকারীরা দিনমানে দূরে আছে, আঁধারে এসে অতর্কিতে হানা দেয়। তাড়া খেলেই

সীমাপার। এদের আবার ওমুখো গুলি ছুঁড়তে নেই, প্রতিবেশী সেই ছুতোয় না প্রত্যক্ষ প্রবেশ করে বসে। কুটনীতির গূঢ়ার্থ গহীন, তলা পেত এক কৌটিল্য পরে মেকিয়াভিলি।

আমাদের সন্নিকটে সীমানার গায় মহীনাথপুর, বড় আখড়া। খলিহানে ধান মাড়াই চলে, বসে আছি দুপুর বেলাটা বন্দুক হাতে বাঘ বাড়ি ঘিরেছে শুনে বাইরে আসা। সমুচিৎ মর্যাদা পেতে কালবিলম্ব হয় না, বারোটা পিস্তল আমাকে বেড়েই উদ্যত। নেতাদের জিম্মায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে শিষ্টাচার দেখায়, এবার হবে শিষ্টালাপ। নেকড়েও মেষশাবকের কথোপকথন, জল ঘোলা করার কিস্‌সা আর কি।

—আপনি মহাত্মার নিন্দা করেন।

—হবে হয়তো, গান্ধিজীর সর্ব কর্ম সকলের ভাল নাও লাগতে পারে, আলোচনা হয়, আশ্চর্য কিছু নেই।

—বড় হাকিম আপনার দোস্ত, আপনি রানার অনুগত, পিঠ্‌ঠু।

—পুরনো লোক, অনেকেই চেনে, বড় হাকিম ডেকে আলাপ করেন বৈকি। রানার পিঠ্‌ঠু যা বললেন, আমরা প্রজা সাধারণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সত্তাকে মান্য করি, দোষের কিছু দেখি না, সদালাপ সাঙ্গ হতে সম্মুখ নেহারি, দেখি, গোঁফ কামায় নিতান্ত খাজা গবেট নয়, সুতরাং আমার পাল্টা প্রশ্ন।

মশয়দের মামলা শুনেছি সরকারের সাথে, নিরীহ জনসাধারণকে উত্যক্ত করার কারণ জানতে পারি কি? কারও পাকা ধানে মই দিই না, তবে কি রাইফেল পিস্তল দেখিয়ে আমাকে নিরর্থক আতঙ্কিত করাই উদ্দেশ্য। শুনুন তাহলে, অন্যায় কিছু করি নি, কাকে আমার ভয়? হাতে আপনাদের পিস্তল আমি নিরস্ত্র, ইচ্ছে গেলে গুলি করতে পারেন। করুন গুলি, ছাতি পেতে দিলাম। লুঠ করতে এসে থাকেন, লুঠতে পারেন, চোর ডাকাতেও কত লুঠে নেয়।

—ভদ্রলোককে গুলি করার জন্য এ হাতিয়ার নয়।

—আমাকে ভদ্রলোক বলছেন। ভদ্রলোকের সাক্ষাতে লোক পিস্তল হাতে আসে, অনোখা এ মোলাকাৎ, নূতন দেখলাম।

আমাদের বিরুদ্ধে আপনি জনমত সংগঠন করছেন শুনে এসছি সরেজমিনে জানি, সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা। অশিষ্টতা ক্ষমা করে একটু চা খাওয়ান, বড়ই ক্লান্ত।

চা পান করে, মশায়রা বিদায় হন। তাই বলছিলাম অরাজকতা ভয়ানক।

বিপ্লবের আবহাওয়াই দূষিত, মতিভ্রম জন্মায়। যেমন আমাদের শিরির, সেও নাকি শেষমেষ বেইমান বনে গেল। জেনারেল রামসম্‌সের অনাথ শিশুকে হাতে করে মানুষ করেন, বিশ্বাসী, তাঁর ছায়া যেন। রাজধানী হতে বিতাড়িত রাম, জনকপুরে বাড়ি বানান 'রামকুঞ্জ'। গরমের দেশে আরামের জন্য ভিতের নিচে তহখানা। কে জানতো যথাসর্বস্ব ওতেই ঢুকিয়ে বসে আছেন। জানে শুধু শিরি, তার হাতেই চাবিকাঠি। অলক্ষ্যে বসানো আছে সুইজারলণ্ডে তৈরী তিজোরী, বিজলির ব্যবস্থা তাতে। যে সে খুলতে গেলে, ছয়টি অদৃশ্য হাত দু'দিক থেকে তাকে জাপটে ধরে, শিরি না এলে উদ্ধার নেই। তাতেই ছিল কিনা সোনার ইট চাঁদির শীল হিরে জহরৎ, বহু টাকার মাল।

বাগজ্ঞান উদয় হতে শিবি, সন্ধান বলে, লুটের নিয়মমাফিক ভাগ পেয়ে ভেগে পড়ল। অল্প নিয়ে অপরাধ কেন করে। ডাঁহা নিমেক-হারামি, বিশেষ মালিক যখন মোকামে উপস্থিত নেই। কতটা তুই পেলি, কি মত ওরা নিলে, সকলকে জমা খরচ বুঝিয়ে দিলে কি দোষের হোত, জেম্মা যখন গছে নিয়েছিস্।

ইংরেজ তখন রাজা, ইতর ভদ্রে তফাৎ ছিল, ছিল রাজ কাজে

প্রয়োজন, সামদান ভেদদণ্ড নীতি তার। জাত বেনে ভোল পাল্টে পাঁচলনড়ি করেছে পাল্লা দাঁড়ি। আর গরু খ্যাদানো তার রাজ্যের ঝামেলা রইল না। এনে দাও সাম্য, সব সমান হোক, তাতে মালের কাট্‌তি বাড়ে। চাষারপোর মুখপোড়ায় কাঁইচি, লাগে গায় পায় হাওয়াই, নাড়ি ধরে ঘড়ি, লটর পটর চাল। ঘুচে মালকোঁচা, ঢোলা পাজামা চরণ ধরে বারণ করে—টেন না আর মাঠের পানে। উচাটন মন, কি যে করি, সুরতে হাল তক্‌দীর বরদস্ত হয় না। নতুন কিছু হতে হবে, হবে কি, খোদায় মালম। বলরামের কাঁধে চড়ে গান গায় সোনি। ত্রাণ শিষ্টরে সামলাই বা লাঙ্গল চালাই। চাষী চাষ করে না, ছোটছুটি কবে কর্মী হতে, বাবু হবে। মুখে কালি না পায় কাদা, কিসে কল্যাণ তুমিই জান দাদা, আমরা এদিকে শুকিয়ে মরি। হায়রে সভ্যতার উদ্ভট রীতি, চুল্‌কে জাগায় অভাব নিতি, মাব খায় আমাদের যে ছিল সন্তোষ।

এই তোমাদের বিধিলিপি। কত রঙ্গ জানে, আগদোর দিয়ে যায় গোরা, আসে কাঞ্ছি বেয়ে, সাথে সামু্‌খুড়ো ঘড়েল মহাজন গোটা-দেশটাই বাঁধা পড়ে যায়, মোটা অঙ্কের বন্ধকী কাবালায়। ভবিষ্যৎ চৌদ্দপুরুষ যথাসর্বস্ব বেচে কিস্তা আদায় দিয়ে যাবে মনে সদা ভয়, মৌরশী পাট্টা না কেউ কেড়ে নেয়। ধুম তোলে প্রগতি পরিকল্পনা প্রকল্প-বিকল্প বিষম প্রপঞ্চ।

দেশের মরা নাড়ি একেবারেই কি এতটা সইতে পারে, হেঁদিয়ে যায়। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, গেরস্তকে ঘর ছাড়া করল। খামারে বসে দপ্তর ধানের খেতে পাট, মাঠকে মাঠ বরবাদ। বাঁধ বাঁধে খাল খোঁড়ে, কোথাকার জল গড়ায় কোথায়। খুটো খাম্বার দেশ ছেয়ে গেল, তারে ধরা আছে নাড়ি নক্ষত্র। যত্র কুত্র বিজলি চমকে, কয়লায় আর কুলোয় না। হিমঘরে চাপা থাকে সুমুদ্দুরের মাছ, গোময় ঘুচিয়ে এল বোরাবন্দি খাদ। গোধন হারায় শিশু, গুঁড়ো দুধ চাটে। মা

লক্ষ্মীরা দশটা পাঁচটা আপিস ঠেলেন। দেখ, তেল জাহাজ ভর্তি এসে মাটি চাপা রয়, আবার অদৃশ্য নল চালা হয়ে কোথাকারটা কোথা চলে যাবে। ঘাটে আঘাটায় মোটর ছোটে, গড়ে উঠে বিমান-ঘাঁটি কি বিশাল! বিস্তর কারবার কারখানা, মেলা হরবোলা প্রতিষ্ঠান, যার মানে বোধগম্য নয়। তবে এটা ঠিক, অখণ্ডমণ্ডলা-কারের মূলসূত্রে বাঁধা থাকে যে জনা যত, তার দেশের কড়ি দেশে ফিরে যায়।

এ কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চল্‌লে চাচা, তাড়া হুড়োয় প্রাণ যায় আমরা বাঁচি না। এগিয়ে চল, বাংডুং খেল আর পঞ্চশীলই রগড়াও যমের দক্ষিণ দুয়ার না দেখে নিস্তার নেই। সামনে এসে ঠ্যাঙায় না আড়ালে শাসাবে, ইন্দ্রজিৎ যে, তাকে ঠেকায় কিসে? খাও দাও গীত গাও—হরি হে, তোমার অন্ত মেলা ভার বিষয় হরিলে, আশয় নাই, নাই ঘর সংসার। পগার পার কর আমারে—একেবারে সবপারে চলে যা।

আর থাকবিই যদি, বৃথাই হাত পা ছড়াস নি, ছড়ে যাবে, জখম হতে পারে। পিয়েল বিহনে মাইলো গোধুম বিনে, মরে যে যাবি ছিরকুটে দন্ত।

মাম্‌দোর পাল্লায় পড়ে ধরল কঠিন রোগ, যার লাগসই দাওয়াই প্রস্তুত নেই। উলট্‌পুরাণ বিহিত বিধি সহজ নয়, তাই বলি—ও সুশীল সুবোধ, নির্বিবাদে ডিম দিয়ে যা। বিশেষ, ভজগোবিন্দং মূঢ়মতে, তিনিই উদ্ধারকর্তা। প্রমাণ যথা—সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ নামোচ্চারণ ভাষনাৎ নশ্যন্তি সকলা রোগা সত্যম্ সত্যম্ ব্রুবাম্যহম্—আপ্তবাক্য মিথ্যে হবার নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতিতে সর্বত্র প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান সূচিত হয়। ইয়াংকি মাকালফলের শোভায় শোষিতেরা সহজেই বিমূঢ়,

প্রচারের মাধ্যমে। প্রজাতন্ত্রের ধুয়ো শোনা যায় এশিয়া জোড়া লড়াইয়ে হতমান ইংরেজ, অনুন্নত দেশের মাথায় বজ্রঘাতের পর, অখণ্ডকে খণ্ডিত করে ভারতবাসীর হাতে দিল। এবার তোমরা ধকল সামলাও।

শোনা যায় ঘর ফুটে, গমার লুটে। ভারত সাগরের ঢেউ পাহাড়ে লেগে কীর্তুনেরা নেপালেও গণতন্ত্রের পালা গায়। শতাব্দীর রানা শাসন অস্তমিত, চলেছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। রাজা এসে আসন আঁকড়ে বসেন, মন্ত্রীরা রাজ্য শাসন করে। এক যায় আর আসে, চার কুড়ি মন্ত্রী এল গেল। একদল ঘোঁট পাকায়, 'খুড়ি' বলে অন্য মণ্ডল আসে, কাজ আর এগোয় না। মুলুকটা ধাপে ধাপে ডুবজলে নেমে যাচ্ছে, কে ফিরাবে, কে ওঠাবে, দিশে দিলাশা কৈ?

·দল পাকাও, জিকির তোলো জগতোদ্ধার, উপসর্গ জোড়া পার্টি। সীট বাগিয়ে নিয়ে, চড়োগাড়ি তোলো বাড়ি মারো পাড়ি মস্কো ইউনো বেলাৎ রোম নিপ্পন সেরাজ, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করে। কলাটা মুলোটা যা জুটে যায়। মূলসূত্র হাভাতের হাহাকার মিটাতে গুহ্যমন্ত্র নিজের পকেট ভারি করতে।

দেশটাকে নিজে চোষ, শালা সম্মুন্ধি শ্বশুর ভাগ্নেকে দাও চাটুক, যে যা করে নিতে পার। প্ল্যান আর স্কীমের ধাক্কায় আপন কৃশ তনু বৃষবৎ হয়ে উঠেছে তো? এবার ওদের দাও, কনট্রোল আর পারমীটের সেলামতে নেয়াপতি ভুঁড়ি বাগিয়ে নিক।

ছ'মাস ন'মাস চলবে ভাল। তারপর জবরদস্ত পার্টি, জাঁকালো নাম নিয়ে উঠে এসে, এদের ঠেলে ফেলে সীট জুড়ে বসে। জগতোদ্ধারদল অলিতে গলিতে ফিরে। কোথায় গেল আঁতাতের বজ্র আঁটুনি, কোথায় বা গালভরা ফরমুলা সব।

আট ন'বছর এ কেত্তন চলল। রাজা বলেন, আর তিনি দল বাছাই করবেন না, এবার সাধারণ নির্বাচন। নূতন খেলা ভোটের পালা—

মুই ভালা, তুই ভালা না—গেয়ে চল এই তেলেনা।

ভোটের জন্য ভাবনা কি ? জনতা জনার্দনের দৃষ্টি লক্ষ্মীর ঝাঁপিটির দিকে। দেশেরটি তো জিরজিরে হাড়গিলে, সাগরপারের কমলার আবাহন কর, বেশ বর্ণাঢ্য, ঝাঁপিটিও গরদখোর। বাসা বাঁধার সুবিধে পেয়ে পেঁচারা এল, সুট্‌কো গণদেবতাকে জিইয়ে রাখছে গ্রাসটা আশটা দিয়ে বাইরে পাঁচ শীলের জোগাড় দেখ, নোড়াগুলোও রেখ ভিতরে ভিতরে, যখন যেটা কাজে লাগে। সম্বন্ধ তো 'ফেল, কড়ি মাখ তেল,' জনগণের বিশ্বাস কি ? বড়গাছেই নৌকো বাঁধ।

দোর খোলা, নানাদিগের হুতুমরা এসে বাগড়া দেয়। গাঁঠছড়া পাকা না হোলে, বাঁধন ফস্কে যাবে, বাইরের ঠেলায়, তখন বিপদ। শক্ত খুঁটো ধরে এগিয়ে এসে, ভুষুণ্ডীরা এদের ঠেলে চিৎপাৎ করে উৎপাৎ জুড়ে দিল। কোঁৎকা মেরে বোচকা কেড়ে নিয়েছে। কত আরাধনায় বসান লক্ষ্মী, পক্ষী চড়ে ঐ ডালে বসে দক্ষিণা হলেন, এদের বেলায় বাম। আফশোষে হাত কামড়ালে হবে কি, সম্বল শুধু—জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ—তাই কর।

এ খেলা চলবে সারাবেলা, পরগাছারা রস টেনে নেয় দেশের মাটি না ছুঁয়েই। এ শোষণ নদীর ওপর সেতু বেঁধে পারে যাবে, সে যোয়ান আজও জন্মায় নি।

রাষ্ট্র কতই দেখি, প্রজার সর্বাঙ্গীন সুখ হোল না। মানবকের অকাল নিধনের দায়ে রাজাকে দায়ী হতে হয়েছিল পুরাণে। রাষ্ট্রের হিতে লোক, না লোকের হিতে রাষ্ট্র, মীমাংসা হয় না। জনপদ সাধারণতন্ত্র, পঞ্চায়েতরাজ একনায়কত্ব, ধর্মরাট্‌-ফ্রাসিইজম্‌, সাম্রাজ্য ইউনিয়ন, রকমফেরের অন্ত নেই। ব্যষ্টি সমষ্টি, পরিবার গোষ্ঠি, স্বদেশ বিদেশ, নানাবৃত্ত ধরে সমাধান খোঁজে মানুষ। কল্যাণ আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। খেলাঘর শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা। চলে শত্রু মিত্র ভাবের আনাগোনা, জমে বাক্‌বিতণ্ডা বিস্তর, হয় তত্ত্ব বহুদূর।

চলরে মন, আর কেন, চল বৃন্দাবনে যাই।

মথুরা হয়ে বৃন্দাবনে ঢুক্‌ছো, তাও অকট্‌রয়। কংসের প্রজাদের রাইরাজার রাজ্যে মাথট্‌ না নিয়ে ঢুকতে দিচ্ছে না।

ঢুকে দেখি, হায় রাম, এই রাজ্য! দয়িত বিহনে সোনার অঙ্গ কালি হোল, তাই কি, এত কালোই হতে হয়। নাকের ডগা থেকে সিঁথেতক্‌ মোটা মোটা সাদা ডোরা কেটে, ভুরু সমেত কপাল ঢেকেছে। তেলক সেবার ঠ্যালায় চেহারা খোল্‌তাই হোল। নিধুবন কেটে সাফ্‌ করেছে, না আছে বংশীবট, নাই সে যমুনাপুলীন। বই দেখে তাজমহল চেনা, গোষ্পদে আকাশ দেখার মত। এ বৈভব ছবিতে ধরা যাবে না, বৃথা চেষ্টা! অনবদ্য সৌন্দর্য্য চেতনাকে অভিভূত করে, চোখ ফেরে না, মন ভরে না।

দিল্লির কেল্লায় বাদশা বসেছেন তখ্‌ত তাউসে। সুন্দর দেওয়ানিখাসের অতিসুন্দর ময়ূর সিংহাসন চেপে। শিরতাজ কোহিনূর কৌস্তভের প্রভায় উদ্ভাসিত। মখ্‌মল জরি কিংখাব মসলিন মনি মুক্তা মিলে রাজবেশের মহার্ঘতা বাড়ায়, সোনার অঙ্কে শোভন বেশ মানিয়েছে ভাল। ঊপরে, সোনার পাতে বিচিত্র মণিমাণিক্যের কারুকলাপ নক্ষত্রলোকের বিভ্রম আনে। হিরে জহরতের সুষ্ঠু আলপনায় মণ্ডিত দেওয়াল। কোন্‌ সে বিয়োগী শিল্পী সবল হাতে লেখনি ধরে প্রাণ ঢেলে এঁকেছিলো এ কৃতি?

কেশ কাংখি কঙ্কন আছে, ব্যাস, তুমি শিখ মানে শিষ্য। নানকের আস্তানা, শিখের সোনার মন্দির পুকুরের মাঝে উঠেছে। অমৃতসর শিখদের গয়াকাশী।

সন্ধ্যা হতেই, চারদিকে জেগে ওঠে ফটাফট্‌ আওয়াজ। একী! আবার জালিয়ানবালা পর্ব শুরু হোল নাকি? শব্দ ধরে এগিয়ে দেখি, পেল্লায় কাণ্ড! তন্দুরে রুটি হবে, তাই পিস্তল দাগার শব্দ তুলছে। মোণ দুই আটা মেখে নিয়ে, চারজন যোয়ান ল্যাংগট কষে

গলদঘর্ম, চট্কে চলে। ইটের দেওয়ালের পিছনে আগুন জ্বেলে লাল করা হোল। দুটি পালোয়ান দাঁড়িয়ে, এক এক থাবড়া নেচি নেয়। তিন থাপ্পড়ে রুটি গড়ে, ছুঁড়ে মারে দেওয়ালের গায়। আওয়াজ ওঠে, যেন গুলি ফাট্ছে। লম্বা ভারি লোহার ডাণ্ডা নিয়ে আঁক্ড়ে এনে ফেলবে হাতের তেলোয়।

পঞ্চাশজন খাচ্ছে শিকারের সঙ্গে রুটি নিয়ে অর্দ্ধচক্রাকারে বসে। রাঁধুনি রুটি ছুঁড়ে মারে ঠিক পাতে, ফস্কায় না। নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশন তড়িঘড়ি হতে লাগল।

রান্না মেয়েদের হাতে। কোমল হাতের মোলায়েম রান্না খেয়েই আমরা গেলাম। মল্লের গড়া, চতুরের হাতে ধাক্কাবালা খানা খেয়ে দিল চাঙ্গা হবে, গায় বল পাবে, তখন বলে যেয়ো।

আনারকলি, ডালিমফুল শাজাদা সেলিমকে মজিয়েছে। বেতমিজ রাজমহলে খুনসুটি অনাচার! হেঁট্কাঁটা ওপরে কাঁটা জ্যান্ত বালাই পুঁতে ফেলল। বিটি কিন্তু অমর হয়ে আছে, লাহোরে আনারকলি বাজার।

লালা মুসা, সে আবার কী! ইঁদুর বাবু হোল কবে?

বাংলা ছেড়েছো, মাত্রা হারিয়েছে; ঘুচে গেছে পাত্রাপাত্র জ্ঞান। এখানে সবই হতে পারে। হুজুরিমল থালিমল হয়, হয় বেঙ্গারাম হরকিষণ। ব্যাং হোল রাম, শিব হয়েছে কৃষ্ণ। শিঙ্গে ফেলে আড়-বাঁশি ফোঁকে হরদম হরিহর আত্মা, দেখে যাও।

লাহোরের পর স্টেশনগুলো সব ইস্পাৎ মোড়া বাড়ি, আলসের ফাঁকে গুলি দাগার ঘুলঘুলি। হরেক ইস্টিশানে লম্বা সাইনবোর্ড জানাবে—দিয়াবাতির পর সেখানে নামা মানা। মাস্টার তো রাইফল ঘসে চোস্ত বানাচ্ছে, টিকিট কাটে কে? আর নামবেই বা কিসের টানে? উঁচু নিচু পাথুরে ভুঁই, গাছের আড়ালও নেই যে তার সুনিবিড় ছায়ায় সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে দুটি কাজল আঁখি তোমার পথচেয়ে

অনিমেষে তাকিয়ে থাকবে।

দরজায় ঝুঁকে, গাড়িতে উঠে এল পরপর তিন পুরুষ, পাগড়ি ছাতে ঠেকছে।

আ সালাম ওয়ালেকম্, মিজাজ সরিফ ঃ তকল্লুফ ফরমাইয়ে।

সড়ে নড়ে জায়গা করে দিই।

তারপর, সেখদের তস্‌রীফ সরিফ কর্দ্দুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

রাবলপিণ্ডি।

নাঃ, ভাতে হবে না, এবার পিণ্ডিতে খেজুর খাব। টিকোলো নাক দুধে আলতা রং যদি পাই, না হয় চোখে সুর্মা টেনে উঠে চড়েই বেড়ালাম। 'দিখোজি চাঁদ চমকা পিছে খজুর কী, বস্‌রেকী হুর নাচে আগে হজুরকী।' হুরপরীই যদি নাচতে লেগেছে, হলোইবা খেজুর বন, তবিয়েৎ তরাবট্ হয়ে যাবে।

পিণ্ডির রাস্তায় রাস্তায় বস্তা বস্তা খেজুর ছোয়ারা আখ্‌রোট বাদাম কিসমিস্ মোনাক্কা, আঙ্গুর বিদানার আমদানী।

কাবুল কান্দাহার হিরাৎ কাশ্মীর থেকে আসে প্রচুর আপেল নাসপাতি নিম্বু খোবানি। ভাবছো, দুদিনেই সুরৎ লাল হয়ে যাবে। গেরস্থের ছেলের অসুখ, ভুগে ভুগে হাড্ডিসার।

ডাক্তারবাবু, জ্বর তো ছাড়ল, গায় বল পায় না, বলে যে।

আরে বাপু, বল কি আর অমনি হবে, মেওয়ামাখম খেতে হয়। বাপ শহর ঘুরে নিয়ে এসেছে একটা বেদানা, কয়েকটা দানা ছাড়িয়ে দিয়েছে, ছেলে খাচ্ছে। আশা ভরা চোখ মুখের 'পর ফেলে শুধোলো —বাজান, তাকৎ মালুম দেচ্ছে না ?

সস্তা পেয়ে গোগ্রাসে গিলছো তো, পেট কামড়ালে এক ঘটি জল খরচ করে বসবে ভেবেছো। সে পাবে না। এখানে নিক্তির তৌলে একছটাক জল বরাদ্দ, তা শুচি শৌচই হোক, আর আমসত্বই কর। বাসন ধুতে জল বরবাদ এরা করবে না। খেয়েছো, থালা ছাই ঘষে

ফুঁকে দাও, ব্যস পাক্। আর একজন খেতে বসে গেল।
পিণ্ডি ফেলে যাচ্ছি কাশ্মীর। মোটারে দুশো মাইল।
পথের মাঝে এ যে বিরাট মেলা, তাঁবুতে তাঁবুতে ছয়লাপ। তাঁবুতে খাস লক্ষ্ণৌ ইলাহাবাদী বিবিরা নিয়ে আসবে মুজরা, তান ছাড়বে ঘুরবে ফিরবে। তিরছি নজরে পাক্‌তুন ঘায়েল হচ্ছে।
—আরে ওয়াহ্‌ ওয়াহ্‌, ইয়ে তো কমাল রহা। দৈত্য সর্দার গলা মিলায়—তু মেরি রওসন্, দিলরুবা কলেজেমে আও। নয়নের মণি হৃদিবল্লভ ওগো, কল্‌জে খাও।
পথে সুন্দর সব রেষ্টহাউস, নদীর কোলে চেনারকুঞ্জে বাংলো। হিমালয়ের বুকে আধুনিক শৈলাবাস, বিদেশীকে পিছু ডাকে। ফেলে যেতে প্রাণ কাঁদে, মন চায় না।
ঝিলমের পাশে গাঁ। দরদী বিধাতা নিপুণহাতে গড়ে এদের, মাখিয়েছে টক্‌টকে রং। গলায় ঝোলে কাংড়ীমালসায় আগুন, হতদরিদ্র সব। মক্তবে মৌলবী পাঠ দিতে, ভাবী নবীরা তার স্বরে কপচায়। বিদ্যে ধর্ম একাকার।
ড্রাইভার বলে—দেখ, ধর্মধ্বজীদের দুর্দশা, ভুল শিক্ষার ফল। বেহেস্তের পথ পরিষ্কার হবে প্রাচুর্যের দ্বারে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রহরী সব। শাস্ত্র বলে ত্যাগ কর। ধনীর লোভী চর মৌলবী সুরীরা শিখোয়, ভোগ সুখ ছাড়। দান খয়রাৎ রোজা নামাজ করলে পরকাল ফরসা, খুদা দোয়া দেবে। দেখ তো বিপদ! প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত। আমার খেদমতে জমিতে ফলে ফসল, জল পড়ে পাতা নড়ে জন্তু জানোয়ার উঠে বসে। আমি ফিরেও তাকাব না, সম্পদে উদাসীন কৃচ্ছ্র করেই গেলাম। আখের, খোদাতালার সাথে মোলাকাৎ, কেঁদে বলি প্রভু, তোমার দুনিয়ায় দুঃখই দুঃখ, কষ্টে জীবনটা গেল।
এক চড়, মরণ আর কি! আহাম্মক, চোখ ছিল না? দৌলতে দুনিয়া, বলিস্ কিনা দুঃখু পেয়েছিস্, নিন্দুক কোথাকার!

বামুন সব পণ্ডৎ। পড়ে লিখে কি পণ্ডিৎ হবে, বাপ ঠাকুর্দার কাছে পণ্ডিতি হাসিল করেই জন্মেছে সব।

পণ্ডৎ মাঠে লাঙ্গল দিয়ে কালিদাসী আখর আঁচড়াতে গেল। দানা-পানি চাই ; বিশ্বেশ্বরী মুনিষকে ডাকতে নসীবালি এসেছে। আট হাতি ডাণ্ডায় ভাত ব্যঞ্জন ঝুলিয়ে সন্তর্পনে, তুলে দিল যবনের কাঁধে। আকাশ পথে পবিত্র অন্ন আসে দ্বিজোত্তম সকাশে, হ্যাংতাল ছেড়ে মেলেচ্ছো তফাতে দাঁড়ায়। জাত জন্ম বাঁচিয়ে, পোঁট্‌লা খুলে নিয়ে লাঠিটা সরিয়ে রাখে।

ভাতও জুট্‌লো, জাতও থাক্‌লো। তীক্ষ্ণবুদ্ধি না ধরলে কি, বিশ্বেশ্বরী পণ্ডতের ছোয়া পেয়েই পণ্ডিতানি হয়!

সকালে ঝক্‌মকে রোদ। জানালা দিয়ে তাকাতে গিয়ে চোখ ঝল্‌সে গেল। রাস্তা ঘর গাছ পাহাড় পালিসপাত্‌ রূপোয় ঢাকা। রাতভ'র ধুয়ে ফুঁকে রজৎ মণ্ডিত হচ্ছিল সব, তাই জল হাওয়ার মাতামাতি, সবাই ঠাণ্ডায় মরি। মহৎ কাজে বৃহৎ আয়োজন উপচার, আমরা সহ্য করতে পারব কেন?

শ্রীনগর শ্রীনগরে নেই, চারদিকে ছড়ানো। হরিৎক্ষেত্র দিগন্ত ছুঁয়েছে, মাঝে মাঝে দেওদার চেনার আখরোট বাদামকুঞ্জ উপবন আর আপেল নাসপাতি বেদানা আঙ্গুরের বাগান।

কেশরের জাফ্‌রাণী ফুলে বাগিচা ঢেকেছে। মাঠে ফুল, ঘাটে ফুল জলে স্থলে ফুলের রাজত্ব। এদিকে যোজন বিস্তৃত ডাল উলার, তীরে দাঁড়িয়ে সাদা মাথা হিমালয়। হ্রদের বুকে বিরাট ছায়া ফেলে দেখছে —তাই তো বুড়ো হয়ে গেলাম নাকি? তবে, ওরা যে বলে গেল —আমি নিতান্ত শিশু। সন্দেহ আর যায় না।

জলে পড়া পাহাড় গন্ধর্ববল, ছোট্ট খোকাটির মত শহরের কোল চেপে বসেছে। নগরের বুক চিরে ঝিলম প্রবাহিত। তারপর মনোহারি নাগরী সেজে হাউসবোট প্রমোদ তরী চোখ ঠারে। লেকের

জলে হাউসবোট ভাসিয়ে বিদেশীরা একনাগাড়ে দু'চার মাস কাটায়, আনন্দের আরাধনা করে। হ্রদে ফুটে থাকে লক্ষ কমল, ফুলে ফলে সাজলো ডাঙ্গা, হৃদ্‌পদ্ম আপনি বিকশিত হয়। সাধে কি নূরজাঁহা, জলের কোল ঘেঁষে নিষাদবাগ করেছিলো, চির সুন্দরের কাছে পৃথ্বীসুন্দরী বসবে বলে।

ঘটনাটা ঘটেছিল কিরাঁচিতে, ভোরে।

পথে পা দিতেই ভেসে এল সুমধুর সঙ্গীত বায়ুভরে। উৎস সন্ধানে এগুচ্ছি, দেখি, পানের দোকান। পানের দোকান বৈকি, সাইজে। নিচে তক্তারলা র‍্যাদাতুরপুণ রেখে, দোকানি দোতলায় বসে কলের গান বাজাচ্ছে। গানটা ভাল লাগতে দোকানে উঠে আসি, মালিক টং থেকে লাফিয়ে নেমে 'আসুন' 'আসুন' করতে লাগল। কিরাঁচিতে বাড়ি সস্তা নয়। মেঝেয় মাচা তুলে ওপর নিচ হোল, নিচে কারখানা ওপ়রে পসার।

গ্রামোফোনটা চমৎকার তো, কি মেক্?

জি হুজুর, ওনমেক্, আমিই বানাই।

আমি আবার কাঠমাণ্ডুতে গ্রামোফোন কিনতে গিয়ে নাকাল হই, তখনকার কথা কিঁনা। মাষ্টার ভয়েজ নেপালেও যা, ভূপালেও তাই; এক কাম, এক দাম। 'ধন্যি গোরাবাবা, শূন্য বসিয়েই দেশটাকে খেলে। সাধে কি 'দেশের কথায়' সখারাম গণেশ বলেছে—সম্মোহন চিত্তবিজয়। খনি খাদ খুড়ে কী আর নিয়েছো, মাথায় ঢুকিয়েছো ব্রিটিশমেড। ছ' টাকার মাল ষাট টাকায় চোখ বুজে কিনে নিচ্ছে। স্বাধীনতার পর আজও জীবন মরণ কাঠি ওদের হাতে। প্রাণের বাড়া ধনরত্ন রাখতে হলে, ব্যাঙ্ক ইনকরপোরেটেড ইংলণ্ডেই রাখে লোকে।

তখনো আকাশবাণী এমন করে কলের গানের জাত মারে নি। ঘরে ঘরে এডিসন, মার্কোনি 'আসব আসব' লিখছে। আমি কিরাঁচিতে

দেখে এসে নিজে একটা ক্যাবিনেট মডেল বানিয়ে ফেললাম, একশোতে। গ্রামোফোন কোম্পানী চেয়েছিল সাড়ে ছ'শো। রেডিও এল তো হুড়মুড় করেই এল। বিড়ির দোকান কসাইখানা সর্বত্র বাজে। পানের কথা আর বললাম না, ওটা নিজে খাই কিনা। পটল তুলবে, শুনে যাও—দিল তোড়কে—লতা গাইছে। শুনতেই হবে, সেকুলার স্টেট যে, হরিরামকে ঠেঙ্গিয়ে তাড়াল। এবার বোষ্টম বোষ্টমীর কাঁখে 'গুপগুপাগুপ' স্তব্ধ করে 'রেডিও সিলোন' ধরে ভিক্ষেয় বেরুলেও অবাক হই না। ভেবেছিল অপরের জাত মেরে পদে উঠবে, হোল তো!

সকালবেলা সাঁত্রাগাছি দেয়, কচি নারকোল ডগার হাতছানি……

আমরা যে কত শক্তি ধরি, প্রজাতন্ত্র না পেলে তাই বা কে জানতো। আঁতে ধরা 'লামাকিরা', শিরে শোভে উৎকুণ, দেহপটে 'জুম্ড়া' ধরি, জ্যান্ত বাঘ আশে পাশে ফেরে। অলক্ষ্যে থেকে যে পিশু, হার্তিকে জলে ডোবালো, আমাদের বিছানায় থাকে। উড়ন্ত ফিরন্ত কটাকে ধরে কাজ নেই। বিদেশী দর্পী কাছে ঘেঁষতে কম্পিত কলেবর, অতর্কিত আক্রমণের জয়। থাকত যদি এর পর আহা মরি সেরি সম্পেন, তবে হোতো সোনায় সুগন্ধ। বৃথাই জন্মে এদেশে আস্বাদে বাদ পড়ে যাই, রানা গোটা নেপালটা ড্রাই মরুভূমি করে ছেড়েছে। মোদের এ দুর্গতি, শোচনীয় অতি, গোরা সইতে নারে, বুক ফেটে যায়, বিশ্বজনে তরাতে জন্ম তার। আহারে, তৃষ্ণার্ত জনগণ! তৃষ্ণার ঝারি নিয়ে দয়াল আর কতকাল দাঁড়িয়ে থাকবে, পায়ে বাত ধরে গেল যে। রানা আড়াল হতেই আবগারী ঠিকে নিয়ে দেশ সরেস করতে লেগে গেছে।

দীর্ঘ উপোসী খেতে গেলে, গোড়াতে হেঁচকি হুঁচকি উঠবেই, কালে সকলি রপ্ত হয়। বর্ষণ আরম্ভেই যুগপৎ ধারাপ্রবাহ কভু কি দেখেছে

কেহ। শুল্ক বিভাগের সবুর সয় না, কিস্তা লেআও। ঢেঁকিকে বুঝাব কত, নিত্য ভানে ধান। সরাসরি কিস্তা খেলাপি মামলায় ফেলে, জেলে পুরেছে। গোবা দেখে, পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে ভদ্রতার বালাই সেখানে নাই।
সে না হয় মেনেই নিত কিন্তু আতঙ্কে কাঁপে হিয়া জন্তু-জানোয়ার গুলোকে দেখে, কামড়ে দেবে যে! দোহাই হাইকোর্টের—কিস্তা খেলাপি কারাদণ্ড মাথা পেতে নিচ্ছি কিন্তু জন্তু-জানোয়ার দিয়ে খাওয়ানোর অধিকার সরকারে বর্তায় কিসে? জাতি সঙ্ঘের মানবাধিকার ধারা দৃষ্টে—কেহ কাহাকেও ভারমিন অর্থাৎ বিভীষণ জানোয়ারয়ালা লোকের সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করবে না—সুবিচার আশা করি।
ধূর্ত ইংরেজ ল্যাং মেরে ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়, বাঘ কামড়ে না ধরতেই ফস্কে গেল।

প্রলয় নাচন নাচেন নটরাজ। ত্র্যম্বকের তাণ্ডবে তপ্ত সূর্য দেহ হতে খসে একখণ্ড, সেই ভূখণ্ড, ছুটে চলে আকাশে। খর বায়ু বয় বেগে ঘনায় বাদল, ধুয়ে ফুঁকে ঠাণ্ডা করবে তাকে। ফলে, জাগে শিহরণ কাঁপে গা। ঠেলে উঠে চূড়ো, তলায় ফেলে অতল গহ্বর, জলে ভরা সাগর।
নেপালী কবে মাপে, কি করে জুখলো, কেউ জানে না। ঠাউরেছে ঠিক, সাগরের 'পর যা উঁচিয়ে থাকে মাথা, সেই 'সাগরমাথা'। আহা মরি নামাকরণ, ভূতত্ত্বের আঁতের কথা। শুলুক সন্ধান করে রাধানাথ, নেপোয় মারে দৈ। বিলেতে বসেই নাম কামায় সায়েব এবরেষ্ট, সে সর্বেহেড নাকি মাথামুণ্ডু। আরে ব্যাটা, ধম্ম দেখলি না, করিলি মুণ্ডুপাৎ! 'সাগর মাথা' ও নিরেট মাথায় না ঢোকে তো,

পাল্টে না হয় রাখ—শৃঙ্গ শিকদার রাধানাথ—নাম, কষ্ট করে যে চিনিয়ে বুঝিয়ে দিলে। তা নয়, নাম ধরেছে—মাউন্ট এবরেষ্ট—বন্ধ্যার গভ্ভ যন্ত্রণা, ভজ জয় রাধে কেষ্ট। গিরির শুভ্র কপালে কলঙ্কের ধবল টীকা, সমাহিত বিরাটের ধ্যান ধারণায় প্রবল প্রত্যবায়—হায় শতধামা!

সেই চূড়ো, নেপালী বলে চুঁচুঁড়ো, তার টাক্রায় বসে তামাক টেনে এল নের্কো সের্পো তেনসিং, সঙ্গে ছিল হণ্ট হিলারি। রাজদরবারে বিপুল তাদের সম্বর্ধনা সমারোহ। নেবকোর পিঠ চাপড়ে বলি—ভাই বাঘ সিং বাঃ, কীর্তি একটা রাখলে বটে! আবার অভিযানে বেরুচ্ছ কবে?

লাফিয়ে তেড়ে আসে বাঘিনী—আমি যেতে দিলে তো। চাই না তোমার ফাঁকা খেতাব, ফাঁকির তক্‌মাশি রোপা। ল্যাও রুপেয়া নকৎনারায়ণ—তর্জনীর ডগায় অঙ্গুষ্ঠ টক্‌টকায়।

বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। প্রাণেশ্বর, বৃহৎ প্রাণেশ্বর, এক সমূহের হৃদয় তার দখলে। তারা ইসারায় ওঠে, কথায় বসে। নেপালী কংগ্রেসে পুরোধা, অমোঘ চৌম্বক শক্তির অধিকারী, যেমনটিছিল নেপোলিয়নে, হালে হিট্‌লারে।

রাজধানীতে লহর লাগে, বীর গাথা মুখে মুখে, নেপালী কেরাই সিং বলতে অজ্ঞান। সে এসে নাকি চাল সস্তা করবে। কেন, কী হেতু তর্ক বৃথা, বিশ্বাস যুক্তি মানে না।

কুমার ইন্দ্রজিৎ সিং, ওরফে কে আই সিং। জন্মস্থান সুদূর পশ্চিম-পাহাড়, নৈনিতালের নিকট দোটি। পাহাড়ী রাজ্য দোটি, কোন এক কালে স্বাধীন ছিল, কুমারের অনটন সে ঠাঁই থাকতেই পারে না। লেখা পড়া তথৈবচ, গরীবের ছেলে, পেটের ধান্ধায় ভারত বর্মা

মাকু মেরেই যৌবনটা কাটায়। কখনও নেতাজীর আই এন এ— সৈনিক, কভু বা হরফন্দমৌলা হোমিও হেকিম সুবাদে ডাক্‌দর। রানা বিরুদ্ধ আন্দোলনে বিশিষ্ট নেতা। জাপানী হামলায় অসমে বর্মায় ইংরেজের ফেলে আসা রাইফেল বন্দুক কুড়িয়ে-বাড়িয়ে লিম্বু কিরাতী ধরে, গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান ভৈরহবাতরাই আক্রমণ করে বসল। পাহাড়ী মগরগুরুং যোদ্ধজাত, কে আই সিংয়ের আকর্ষণী শক্তির টানে দলে এসেছে।

নেহাৎ নেহরু ধরে করে রানা মন্ত্রী সভায় কংগ্রেসী ঢোকায়, হয় বিদ্রোহের অবসান। এ আপোষে অসন্তুষ্ট কে আই সিং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ বলে দিতে হোল বন্দী। সিং দরবারে কড়া পাহারায় অবস্থান তার। খাঁচায় বাঘ অন্তরে গুমরায়, বাহিরে প্রকাশ নাই, মন্ত্রীরা বিদ্রোহীকে মুঠোয় পেয়ে নিশ্চিন্ত।

মগরগুরুং লিম্বু কিরাতী, লড়াই ফেরৎ সব ব্রিটিশ গোর্খার সেপাই দরোয়ান, ভারত বর্মায় যথা তথা ছিল ছড়ানো ছিটোনো। ডামাডোলে লুটের গন্ধ পায়, নকরি ধান্ধা চুলোয় গেল, দলে দলে ধেয়ে এল। বিশেষ করে তাদের ধরেই নেপালী কংগ্রেস সংগঠন। এরাই মুক্তিসেনা, সমতলে খাজানা লুঠে। অরাজকতার সুযোগে আগুন জ্বালায়, কথায় কথায় গর্দান নেয়।

বছর পাল্টায়। রানা রাজার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দিতে মৌকা পেয়ে মুক্তিসেনা রাজধানীতে ঢুকে পড়ে। রানা পরিত্যক্ত দরবার সব তাদের জবরদখলে। মুক্তিসেনা নেপাল উপত্যকায় বিভীষিকা। মঠে মন্দিরে বাহিরে ঘরে অভূতপূর্ব লুট, লোকেরা ত্রাহি ডাক ছাড়ে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা এককালে নিজের মতলবে মাথায় নেছেন, আর তারা নামে না, কমলি ছোড়তা নেহি।

দায় এড়াতে শহরে সর্বত্র, কারাগার আপিস ধনাগার ব্যাঙ্ক সদর-কার্যালয় সিং দরবার, ইস্তক মন্ত্রীদের দেহ গেহ রক্ষার কাজ

জওয়ানদের মুক্তিসেনা এবে রক্ষা সৈন্য, তবু যদি তাঁবে থাকে।
চৌম্বক পৃষ্ঠ তারা একদা এক প্রদোষে কে আই সিংয়ের খপ্পরে পড়ে রক্ষীরা হয় বন্দীর একান্ত বশম্বদ। কে আই সিং কারাগার উন্মুক্ত করে নগরীর অধীশ্বর। ব্যাঙ্ক কোষাগার তোপখানা সিং দরবার তার দখলে, মন্ত্রীরা বন্দী।
সূচনাতেই, হামলার মিনিটকয়েক আগে, খবর পেয়ে কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী কোইরালা দে ছুট, দেয়াল টপকে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ে বেঁচে গেছেন। পুরী, রাষ্ট্রসেনার হেফাজতে সিংহের থাবার বাইরে ছিল। যোগাযোগ ছিন্ন ভিন্ন, মুক্তিসেনা ঘাঁটি আগলে আছে, উপত্যকায় অন্যত্র ব্যারাকে ধরা রাষ্ট্রসেনা ঘটনা জানে না।
কয়েদীদের দিয়ে নিশিথেই প্রেম্‌সে হাওয়াই আড্ডা খোঁড়ায়, বাইরের উটকো আপদ এসে না শুভারম্ভে বিঘ্ন ঘটিয়ে বসে। ঠিকেদার রামকমলকে ধয়ে রাত্রেই মুক্তিসেনার রসদের কাবালা পাক্কা হোল। বীর দর্পে আবু হোসেন করে নগর পরিক্রমা, মোহড়ায় গার্ড বসায়।
রাতকাবারে এবার সিংহের মহাপ্রস্থানের পালা।
প্রত্যূষে গোণাগুন্তি ক'জন রক্ষী সঙ্গে অগোচরে নগর বাহিরে বীর পদক্ষেপ অনুগতে এড়িয়ে গেল। বলেছিনু চৌম্বক'শক্তি, বটে কিনা ? অনিয়ন্ত্রিত অসুরদের সুনিয়ন্ত্রিত চালে চালবার অপর কী মন্ত্র বিদ্যুতে আয়নায়। হাতে পেয়েও অরক্ষিত নগর তোষাখানা কারবার লুঠে নাই, বিবেকের তারিফ না করে থাকা যায় না।
রাজধানীতে শীতের সকাল।
আবছা আঁধারে নজরে পড়ে ঘাঁটিতে মোতায়েন মুক্তিসেনা। লোকেরা ঘরে ঘরে জটলা করে—কি হয়, কি হয়। সহসা রাষ্ট্রসৈন্যের অভ্যুদয়, মুক্তিকে আদেশ করে—হ্যাণ্ডস্ আপ্।
সে এক দৃশ্য বটে ! গড়িমসি কিঞ্চিন্মাত্র নেই, গোপালরা অস্ত্র ফেলে উদ্বাহু। হাতিয়ার হারিয়ে গুলি গুমোলো গুটি গুটি বন্দীশালায়

যায়।

এদিকে কে আই সিং খিদে পেলে গাঁয়, মাতব্বরের ঘরে খাবার চেয়ে খায়। পান তামুকের তোয়াক্কা করে না, বলে—কুইক মার্চ। খবর এল যে, রাষ্ট্রসেনা পিছু নিয়েছে। সন্ধ্যা ঘনায়। তির্বতী-সীমানায় খাড়া পাহাড়, পা ঘেঁষে তার খরস্রোতা নদী বহে যায়। আঁধারে খাদের গভীরে নানা বিপদজনক জেনে সিংহ চূড়োয় উঠে বসে।

রাষ্ট্রসেনা পাহাড় ঘিরে ঘাঁটি গাড়ে। রাত্রি দুপুর অবধি চলে নিচে উপরে গুলি চালাচালি, রণনীতির মহড়া। পাহাড়ের তিন দিকে প্রহরা ও পাশটা নদী ঘেরা বাঘ চালে সিংহ থাকে ধরা। হেথাকে আস্তাকুঁড়, হোথায় আছেন বট্‌ঠাকুর, ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চোর, যাবা কম্‌নে?

ভোর না হতেই সৈন্যরা গুলিবর্ষার আড়ালে পাহাড় চড়ে। কি আশ্চর্য। গুলির জবাবে পাল্টা গুলি এল না, চূড়ো চুপ কেন? উঠে করে বুঝতে পারে, অন্ধকারে গাছ কেটে ফেলতে হয় সেতু। গুলির গুল মেরে, আয়োজন সেরে, সদল বলে সিংহ দেশান্তরী হোল।

কালান্তরে অবশ্য রাজা গুণধরকে আদর করে ডেকে এনে প্রধানমন্ত্রী করলেন। সিংহ কখনও পোষ মানে? সব ছেড়ে খুঁড়ে আবার যে কে সেই, কে আই সিং। চাল সস্তা হয় না।

সকালবেলা সাঁত্রাগাছি দেয়, কচি নারকোল ডগার হাতছানি। কলাপাতা দুলিয়ে, শীতলস্পর্শ বুলিয়ে, বাংলা প্রবাসীকে ঘরে তুলে নিল। শ্যামলীমা পরায়, উষর মরু আর কালো পোড়া ভূঁইয়ের দৃশ্যে ঝল্‌সানো চোখে স্নিগ্ধ অঞ্জন।

বহুদিন পর এলাম গো মা জননী, সকলি মঙ্গল তো?

আজ্ঞে কত্তা, হক্কলি মঙ্গোল, কালাকুত্তাডা মাৱা গেছে। বাবু বিদেশ থেকে বাড়ি এলেন, স্টিমার ঘাটে চাকর কছিমুদ্দি নিতে এসেছে।

কাছিম এসেছিস, সব ভাল তো?

—আজ্ঞে কত্তা, হক্কলি মঙ্গোল, কালাকুত্তাডা মারা গেছে।

—আহা, অমন ভাল কুকুর কিসে মরল?

—ঘোরার হাড্ডি খাইয়া।

—সে কী! ঘোড়াটা মারা গেল?

—দানা না পাইলে, কয়দিন বাচে?

—কেন, সেদিন দু'মণ ছোলা পাঠালাম?

সে তো ঠাকুরমার সেরাদ্দেই লাগলো।

মা মারা গেলেন, সে কি রে?

হঃ, নাতির শোগ্ডা বড়োই লাগ্ছিলো কিনা।

খোকা নেই বলিস্ কী?

মা মরা ছ্যাইলা, বাচ্লো কৈ।

বড় বৌ নাই, হায় হায়।

শ্বশুরের শোগ্ডা বরদস্ত হইল না, মা জননী তাতেই শ্যাস্ হইছেন।

বাবাও গেলেন, হা ভগবান।

ঐ বুড়োই তো পথ দেখালো।

শৈশবে যে বাংলাকে ছেড়ে গেছি, তার বহু পরিবর্তন হয়েছে, ভাল তো কিছু নয়, সোনার বাংলা ধ্বংসের মুখে। ইংরেজী পড়ে গাঁ ঘর ছেড়ে, শহরের দিকে ছুটেছে সব, গাঁয় থাকে বুড়ো, অকর্মণ্য, কিম্বা যারা ইংরাজী দুপাতা ওল্টায় নি। স্বদেশী যুগের জের না মিটতেই এল মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ জিতে ইংরেজ বল পেয়েছে, বাঙালী পেল অন্নবস্ত্র সমস্যা।

বাংলা জমিদারের দেশ, তারাই দেশের প্রাণ কেন্দ্র।

জমিদারের পোষক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, তাতেই ধাক্কা দিল ইংরেজ, প্রজাসত্ব আইন বানিয়ে। আর জমিদারি নিয়ে থাকলে কারও পোষায় না। জমিদারেরা গাঁ ফেলে শহরে এল অন্য অবলম্বন খুঁজতে গাঁয়ের সুখ সমৃদ্ধি ঘুচে গেল সঙ্গে সঙ্গে রাজার সঙ্গে সাজা, বুঝলে তো তার মজা,—একটা মহান্ জাতি শেষ হতে চলেছে। এমনি অন্তর টিপুনি, বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। ইতুর মাটির ভিতর গোড়া কুরছে, মহীরুহ চলবে আর কি। মোক্ষম প্রহার র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা, হিন্দপাক্স্তান।

সরষে নেবে গো, অ কলয়ালা ?

ও সরষে চলবে না ভাই, পিলি সরষেঁা, হাপুবের আমদানি তারপর নগদা কারবার তো নেই, ও সব ওয়াদায় চলে। বড়বাজারে গুঁড়িয়াল, সেই যোগায় মাল, পেড়ে, তেল বিকুলে ভুক্তানি নেয়।

কানপুরের হাবাই ঘোড়া আছে। ওবা যে বেটে কলকাতা আসে, সে রেট তোমাব হবে না, রেল বেশী ভাড়া চায়। বাজারটা দেখবে তো হাওড়ায় যাও।

ট্যাকসি স্ট্যাণ্ডের পাশে গঙ্গার ওপর ঘব, ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা চরে, ভিতরে লোক ঠাসাঠাসি, মাড়োয়ারি দেশোয়ালী সব। সরষে মটর কলাই ছোলা ডালের অল্প অল্প নমুনা রেখে মাটিতে বসেছে। ঠেলা-ঠেলি হুড়োহুড়ি, তাব ভেতর লাখোটাকার কারবার।

মাল এসে রেলে আছে, বিণ্টি নমুনা নিয়ে ব্যাপারী বসে। খরিদদার এসে চালানদারের হাত ধরেছে, একব্যাটা দালাল নতুন গামছা দিয়ে হাতদুটি ঢেকে দিল। আঙুলে আঙুলে দরাদরি হয়ে রফা হয়, খরিদ বিক্রি হয়ে গেল, কেউ টের পায় না এ ষড়যন্ত্রে বাঙালী পাত্তা পাচ্ছে কৈ ?

চায়ের বাজার বিলিতি, ওটা ওদের চলে কিনা, লণ্ডন হতে দর আসে। চা বানাতে বাঙালী যকৃত দিল, রক্ত দিল। যে আবহাওয়ায় চা জন্মায়, তাতেই বাঙালীর মরণ। কালা জ্বর লিভার বাড়ায়, রক্ত শোষে, দেহটা খুখলো ফুলে ঢোল। ডুয়ার্স আসামের জঙ্গলে পড়ে থেকে বাঙালী চাকরে, কোটা বাঁধা পেটিবন্দী চা, কলকাতা টি বোর্ডের গুদামে জম্‌ছে। চা নিলামে বিক্রি হবে, ব্রোকার সব ইংরেজ, অন্যে ডাক পায় না। বাগান পেল পাউণ্ডে চার আনা আট আনা বাকি বাজার ব্রোকারদের। দেখছো তো লিপটন্ ব্রুকবণ্ড, বাগানে না ঢুকেই বাজারে চা ছাড়ে, মোটা হাতে মুনাফা কামায়, লিভার ঠিক রাখে।

পাটকল ডাণ্ডির, বাজার স্কচ, ফড়ে কেঁয়ে। স্টক একস্‌চেঞ্জে চেঁচামিচি ঠেলাঠেলি, কোটিপতি পাগড়ি বেঁধে, কপাল চন্দনলেপা, ভুঁড়ি লড়াচ্ছে। তার ভিতর ঢোকে সাধ্য কার, ভদ্র বাঙালী তফাতে আছে। সকালবেলার উজির রে ভাই, ফকির সন্ধ্যাবেলা আবার ঐ মাটি ধরেই উঠবে, হিম্মৎ আছে। মুখের কথায় লাখো টাকার কারবার, কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ, কপাল চাপড়াচ্ছে। শেঠ পড়লে শেঠেরা তাকে তোলে। বাঙালী পা ফস্‌কালে, ভদ্রলোকেরা মাথায় পা দিয়ে ডোবাবে, এটা জাতিগত।

বড়বাজার ক্রশ স্ট্রীটে জৈন শেঠ লম্বা কল্কে টানে, বাহারে পিতলে বাঁধানো কল্কে, পাবার আশায় আনাগোনা করি। একদিন দেখি, মেলা কল্কের আমদানি, বহু শেঠ জুটে গড়বড় বাৎচিৎ। কি বলছে এরাই জানে, কল্কের তলায় ভিজে ন্যাতা জড়িয়ে ঘন ঘন লম্বা টান মারতে লাগল। শুধোই—ব্যাপার কি, আজ এ কিসের আসর?

—অন্যায় দেখ না গুরমিণ্ট কন্‌টোল উঠিয়ে লেবে।

—হ্যাঁ, কাগজেও দেখছি, কন্‌ট্রোল থাকবে না, লিখেছে।

—রেখে দাও ওদের লেখা, উঠিয়ে দিলেই হোল আর কি। আমাদের

গুদোমভর্তি গাঁট, কি দশা হবে ও কাপড়ের।
—সরকার উটিয়ে দিলে, করছো কি বল ?
—বুঝলাম কিছু চায়, কালই ডেপুটেসন যাবে দিল্লি, সব ঠিক হয়ে যাবে।
হোলও তাই। দেখি ওই কাগজই জানাচ্ছে—কন্‌ট্রোলের মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়ানো, গভমেণ্টের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। কার বাজত্বে বাস, সাফ মালুম দিল।
মাথার পোকা, ইঁটের তলায় বাস, ইঁটপোড়ানোর কিলেন রহস্য জানতে হবে। বুল সাহেব এদেশে চিমনির ভাটা চালায়, তারই অনুকরণ সর্বত্র। কোনটা গোলভাটা, পাশে ছত্রিশফুটি চিমনি। আবার একটা দেখি, বাদামি ভাটা, মাঝে পাশাপাশি সাতাশ ফুটি জোড়া চিমনি। লম্বা ভাটার সামনে বড়, পরে ছোট চিমনি আগু পিছু চলেছে। গোলভাটা বলে, ইসিমে অচ্ছা পক্‌তা হ্যয়, বাদামি বলে ইসিমে, আর লম্বা তো বলেই বসে আছে। সমস্যায় পড়েছি, সবাই যখন—'আচ্ছা পক্‌তা' তখন রকমারি কেন ? কোন একটা হলেই তো হয়।
ভারতের তামাম বইয়ালা লিখলো—কিলেন ভাটার কেতাব পাবে না, ডাইরেক্‌টর ইন্‌ডাস্ট্রি হদিস দিতে পাবে না। এনজিনিয়র বলছে —মাথা ঘামাও মৎ, মিস্ত্রি ডেকে বরাৎ দাও, তোফা ইট হবে— ফাঁপরেই ফেলল। উত্তর বিহার উত্তব দেয় না, অনেক ভাটায় ঘুরলাম, একবার কলকাতা ঢুঁড়ে দেখি।
টালিগঞ্জের জাঁদরেল ভেটেরে মিস্তির, পশ্চিমে মিস্ত্রির লেজ ধরা। যাই দেখি বালী, ইটের রাজপাটে। বালী খালে বাস্ থাকল, যাচ্ছি গাঁয়ের ওপারে ভাটার মেলায়।
একটা পচা ডোবা, তিনধারে তার খুঁটিতে বসানো দর্মাঘেরা আব্রু। গন্ধলেশহীন, সব জলসই হচ্ছে কিনা। তার আবার একটা ঘাটও

আছে, পুকুরই ছিল হয়তো। জনা দুই লোক, কাদা ঘেঁটে পুট্‌লির পর পুট্‌লি টেনে তুলেছে। দিনভর যা পেল, প াঁকে পোঁতা আছে—ছানা তাজা রাখার কৌশল। এই সকালবেলা তুলে এনে যোগান দেয়, শহর কলকাতার খাবার দোকানে। তা ঘেঁটে, নাগ সেন ঘোষেরা, কাগজের বাক্সে ঘরে ঘরে পাঠাবে, দেবভোগ্য মিষ্টান্ন। হাতের গুণে বর্ণে গন্ধে অনবদ্য, মুখে নিলেই সোডাজল খুঁজতে হয়। এও দেখি, তথৈবচ, ভাটাতত্ত্ব এখানে পাব, সেগুড়ে বালি। তবু যা হোক, কায়দাটা জানা গেল, ছানা তাজা থাকবে।

রাজধানীর সদরে অন্দরে ঘুরলাম, বাঙালী কৈ ?

এই যে বাঙালী, তান্ত্রিক আশ্রমে। যেখানে রেখা গণনা, সিদ্ধ কবচ ঝুলিয়ে ঘুমুলে লাখোপতি হবে, তার মন্ত্রণা।

ঝাঁকড়া মাথা, কপালময় মাকালীর সিঁদুর, সিল্কের পাঞ্জাবীর পর রক্তজবার মালা। ত্রস্তে এসে হাত পাতলো—দেখুন তো ললাটের লিখন।

—প্রশ্ন পিছু এক টাকা অগ্রিম বাপু, ক'টা প্রশ্ন, টাকা জমা দাও।

তিন টাকা জমা এল।

—বর্তমানে আমার মনের অবস্থা কিরূপ ?

—স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার, অশান্তিতেই আছ বৈকি।

—যাকে ধরেছি, তাকে পাব কি ?

—গ্রহের দৃষ্টি আছে, রিষ্টি কাটাতে শান্তি করতে হবে, তবেই স্বস্তি।

—অপর মনস্কামনা সিদ্ধ হবে তো ?

—উপস্থিত হাত না লাগানই ভাল, অর্থসঙ্কট চলছে কিনা।

—জবাব ঠিক ঠিক মিলেছে, এখন উপায় ?

—চৌষট্টি টাকা খরচ, পুরশ্চরণ করে কবচ বেঁধে দেব, আর দেখতে হবে না। আর একদিন আসব, বলে যজমান বিদায় হয়।

—দেখলে তো ভায়া, কষ্ট করে শাস্ত্র পড়ে এই ভেল্কি খেলে পেট

চালাচ্ছি। ব্যবসায় ঘেন্না ধরে গেল।

ব্যাপারটার রহস্য জানি না, যা যা বললেন ঠিক মিলেছে, বলল যে —এমন পরিষ্কার বিষয়টা বুঝলে না? অভ্যেস নেই তো, নেহাৎ সোজা কথা। ইয়ংম্যান উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, স্ত্রী ঘটিত না হয়ে যায়? পোশাকেই দেখছো বাপ বড়লোক, বখাটে ছেলে বাপের তাঁবে থাকে কখনও? একটা উপ জুটেছে, খরচ চাই। আলাদা কিছু করবে, তাই কি হয়, ক্যাপিটাল চাই তো? আমি হাড় নেড়ে, রেখা আঁচড়ে, মুখে বিড়বিড় করেছি আর ওর মুখের ভাবটা দেখে যাচ্ছি। মনস্তত্ত্বটা একটু তলিয়ে দেখো। ভাষার উপর একটু দখল, যার মানে এ্যাও হয় ত্যাও হয়, এমন করে বলা। জবাব মিলে যাবে, কথা কি?

আসামে 'বঙ্গালখেদা', পশ্চিমে 'বঙ্গালী নিকালে', পাকিস্তানী নাকি ছুরি শানিয়ে রেখেছে। নিজের মুলুক আছে সবারই, বাঙালী শুধু নিজ বাসভূমে পরবাসী। 'ওপর জমাদার হতে' এক পা উঠলেই হয়। জমিদারবাবু, রোয়াব কায়দা কেতা দুরুস্ত। দেউড়ির দারোয়ান তিন বছর উমেদারিতে আছে, নকরি বহাল হয় না তার। জুতো জামা পেটি পাগড়ি ঘুচে, স্রেফ কপনিতে এসে ঠেকেছে। লাঠি হাতে হামে হাল সদরে হাজির। নাগাবাবা অন্দরে বাবুর দোরে হানা দিল, দরোয়ানের বুঝি এবার গর্দান যায়।

দেউড়িতে ছাড়া কাহে?

গরিব পরবরস্ দীনে দয়া করবেন। তিন বছর উমেদারির পর আমার তবু কপ্‌নি রয়েছে, ইনি তো দিগম্বর। 'ওপর জমাদার' না হয়ে যায় না, বেশি দিনের চাকুরি। দেখামাত্র সেলাম ঠুকে দেউড়ি ছেড়ে দাঁড়িয়েছি।

চিনাংশুকে চিঁড়ে বাঁধা চলে না। কমনীয়তা কর্কশ ছোঁয়ায় মুহ্যমান

মলিন হয়ে পড়ে। তাই শুদ্ধ কবি মন স্থূলহস্তাবলেপের শঙ্কায় সঙ্কুচিত দেখা যায়।

কবি কব্‌লেছো, ঋষি বল্‌ছো যাঁকে, তাঁর চিন্ময়ীমূর্তির গায় মাটি মাখাব? 'চন্দন পড়ে চমারঘর, নিত্যকুটে চাম'। গদা ঘোরাবে তো গাম্ভারি দেখ, চন্দন কাড়তে যেয়ো না, তোমার ভাল তোমাতেই থাক্। এ যেন র‍্যাফেলের ছবির গায় তুলির পোঁচ লাগাবার ধৃষ্টতা, তাজমহলের কাঠামোয় খুঁৎ খুঁটে বার করবার মতো পাকামো। যে বিপশ্চিৎ সাতকোটি কণ্ঠের কলনিনাদে বিভোর, তাঁর কর্ণকুহরে ত্রিশ কোটির বিষম কোলাহল ঢালবার প্রয়াস, অমার্জনীয় অপরাধ। এ যে পরমান্নে রোটি পুরি চানা চাপাটি চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা। অন্যের জাত যায়, কদন্ন কদর পেল না, যা হোল সেটা স্রেফ বদ্‌হজম। কবিগুরু অর্ধশতাব্দী আগেই আমেরিকায় ওদের বলে এসেছেন য়ুরোপে এক নেশান বহু বিভক্তি, ভারত মহাদেশে বহু নেশান, কাজেই মিশ খায় না। আর নেশান, ধোকার টাটি য়ুরোপে জন্মেছে, সেখানেই না হয় রইল। সাগর পারের সব জিনিষ তো আর ঘরে তোলা চলে না।

য়ুরোপ জোড়া এক জাত, এক ভাত। যেমনটি কোন্নগরের কনে চাট্‌-গেঁয়ে বরের ঘরে চলে যায় অবহেলে। কাছা কোঁচা মিলে যাচ্ছে, ঝোলে ঝালে এক রকমই খায়। আবার আটকা পড়লে দেবতাকে ডাকাডাকি, এর যা তারও তাই। হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠোকাঠুকি, ভিড়ে হয়েই থাকে। ক্রুসেডের বেলায় দেখ, সকসন্‌টিউটন্ সেল্ নরমন একাকার, হিদেন ঠ্যাংঙ্গাতে চলেছে।

হিন্দোস্তানে ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে শাসন তাড়ন বশীকরণ উচাটন চলে এসেছে চিরকাল, ইতিহাস সাক্ষী। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়, পরধর্ম আরও ভয়াবহ সর্বনাশ ডেকে আনে। বাঙালী যেন বাঙালী হয়েই বেঁচে থাকে, হে ভগবান।

যে কোনও দেশকে দেখতে হলে, চাই দেশদর্পণ। তিনটি ছায়া পড়ে তাতে—বৈভবের, বুদ্ধির আর কৃষ্টির।

আইসেন্‌হাওয়ার আগমনে দেশে সাড়া পড়ে যায়, দিল্লিতে অভূত-পূর্ব লোক সমাগম। জনগণের চাওয়ার আর কিছু নেই। একমাত্র প্রার্থনা—অন্ন দাও। আধিভৌতিক অপ্রগতির মাপ কাঠি দিল হাতে। ভারতে এসে আর দেখবেন কি? দেখবার মত ঐ একটাই তো আছে। সবেধন নীলমণি, তাজ।

তাই দেখাতে নেহরু নারায়ণকে নিয়ে গেছেন। বিরাট বৈভবের সামনে পড়ে সম্মোহিত দানব নিঃশেষে অভিভূত।

এই তাজ! আমার বাল্যের জিজ্ঞাসা, কৈশরের স্বপ্ন, প্রৌঢ়ের সমীক্ষা। এ বিশাল সৌন্দর্যকে মানুষ ধারণায় ধরেছিল কি করে, আমার বুদ্ধির অগম্য।

একেবারে অজ্ঞান।

জ্ঞানোদয়ের ভার স্বতঃই এসে পড়ে নেহরুজীর 'পর। নইলে অতিথি মারা পড়ে।

প্রেসিডেন্ট, মিনারগুলো তাজের কাঠামোয় অবান্তর, বিসদৃশ নয় কি?

এ মহত্বের সামনে যে কোন মন্তব্য অকিঞ্চিতকর হবে মনে হয়, প্রাইমমিনিস্টার মিস্টার।

এমন মোলায়েম মার, কূটনীতি বিশারদরাই দিতে পারে। এদিকে যে আমাদের বুদ্ধির দৌড় ধরা পড়ে গেল, সেই যা দুঃখু।

নেপাল দেখতে এলেন এলিনর রুজভেল্ট। ভূপর্যটনের তালিকায় নেপালের ভাগে পড়ে ছত্রিশ ঘণ্টা। এরই ভেতর নেপাল দেখে তাঁর প্রসিদ্ধ বইতে লিখলেন তিন লাইন।

—নেপালের লোকেরা আজও পিঠে তুলে বোঝা বয়, এদের অগ্রগতি সুদূর পরাহত। আমাকে বেড়াতে দিয়েছে রোলস্‌রয়েজ কিন্তু রাস্তার

অবস্থা শোচনীয়।

মাত্রাজ্ঞানের দয়নীয় অভাব। বাস্, নেপাল দেখা শেষ, সেই ত্রিসূত্র। হীনমন্যতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর, এ কেবল জ্ঞানাঞ্জনশলাকা। আগে তো ভাত কাপড় জুটুক, পরে না হয় কৃষ্টি কুলটুর সামনে ধরে দেব।

কলকাতা ভদ্রমেধ যজ্ঞশালা। হোতা ইংরেজ, কেঁয়ে গুর্জরী ভাটিয়া-সিন্ধি তন্ত্রধার। সমীধ যোগাচ্ছে বজরংবলীর চ্যালা সব।

নর্গ ফল প্রত্যক্ষ, পাঁয়তাড়া ভাঁজে দন্তধারীরা। অস্মুল করে পারের কড়ি মালগুজারি ট্যাক্স মাশুল বাবদবারি, পাই পয়সা পর্যন্ত কারো রেয়াৎ নেই। টক দৈ কাছা টিকি, সব পাকানো। ধাক্কা না খেলে সড় হয় না, সূক্ষ্মানুভূতির ধারে কাছে যাবে না। রংমশাল জ্বেলে বসে নগরী, সুখের আশায় গৃহ ত্যজি ছুটে এল নাগর। ধাঁধাঁয় পড়ে ধন মান খোয়ালো, হোল যজ্ঞের আহুতি। ইংরেজ পেল ঋদ্ধি, যাজ্ঞিকেরা চরুর ভাগ, ইতর জন হরতুকি আমলকিতেই তুষ্টু।

কুটুমবাড়ি দৈ যাচ্ছে। চিৎ করা মাটির থালায় গড়িয়েছে বেশ, গভীরতা কম। পশ্চিমের চড়া রোদ, তেপান্তরের মাঠ, বটের ছায়ায় বসে আছে মরদ। এক ভেইয়া তড়পাতে তড়পাতে এসে বলল—বড় তেষ্টা, একটু দাও না, মুখে নিয়ে জুড়োই।

উঠল তেড়ে মেরে সমধিয়ান্ যাচ্ছে দৈ, বলে কিনা দাও। কি আর করে বেচারা, সতৃষ্ণ নয়নে দেখছে আর হাওয়া খাচ্ছে। এল এক তেলেঙ্গা। মস্ত যোয়ান, হাতে পাকানো লাঠি।

—এই, রোদ লেগেছে, দৈ দে।

—কি করে দিই বল, সওগাৎ।

বিরিশির ওজনে এক চড় কষিয়ে, দৈ খেয়ে থালা ভেঙ্গে নিজের পথ নিল।

দুজনায় দেখে নেয়. তেলেঙ্গা গেল, দুই হোথায়। ভৈয়া বলছে

সমধিকে—তিয়াস্ মিটাতে কনিক চেয়েছি, দিলে না, এ যে বেবাক গেল।

সমধির ক্রোধ চেগেছে—তুই অমন করে চেয়েছিস্ ?

বাংলার মরণ এখানেই, অত মোটা করে বুঝতে শেখে নি। সমবেদনশীল মন, ভাবের ঘোরে যাকে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পকেটমারের সুবিধে করে দিল।

বাংলা মা, চোখের জল ফেলে ফেলে জ্যোতিহীনা, তবু কোল পেতে বসে আছে। একদিন হোমানল নিভলে সন্তানেরা ঘরে ফিরে, স্বস্তির নিশ্বাসে তার বুক জুড়োবে।

রাজকাহিনীর

পর

এক রাহী একরাহী এল। নেপাল থেকে ··

আষাঢ় হে সখি, রিমিঝিমি বরষঁই—সকাল হতে বিকেল, কাদা জলে রোয়া ধানের চারা পুঁতছে, হৈমন্তিক ফসলের আগাম। কাঠের লম্বা তক্তায় বাঁশের দুটো ছিপ বাঁধা, পুকুর পাড়ে অশথ শাখে ঝোলানো ঝুলনা। ধারা স্নাত জ্যোৎস্নার পাতার ফাঁকে উঁকি-ঝুঁকি, বেয়ার পুবৈঁয়া রঙ্গিনীদের আঁচল ধরে উতলই হলো বা বিদ্যাপতির যারা মানস প্রতিমা, তাদের ধরে, দোলনা পুবের স্বর্গ ছুঁয়ে এল, এবার ওপারের অম্বরে যাবে। আস্ দিয়ে এদিক থেকে ওদিক, আনন্দ পসরা তুলে ধরে গীতিময়ীদের সমর্থ দুটি কান্ত।

তলায় বাঁশের বাঁশি, সুরে সুর তুলে, সঙ্গীত মুখর সন্ধ্যার অবতারণা সম্পূর্ণ করল। ক্লান্ত পথিক, দাঁড়াও বারেক, দিনের শেষে গানের রেশ মনে প্রাণে মেখে নাও, তোমার অনাগত মধুময় হবে।

অধিকারীর দালানে খুবলাল খুব জমিয়েছে। বুক ঠুকে, হাত ছুঁড়ে গেয়ে বলে চলে, 'আলহারু দল মহারায়' কীর্তিকলাপ এ যে বীর গাথা অক্ষমকে ওজস্বী করল! গায়ক যশস্বীর গমক ধমক বচন কদম, উঠে বসে হাঁটু মুড়ে ফুটিয়ে তুলতে, জীর্ণ তনুতে শীর্ণ জ্ঞান হয়রান করে এনেছে। ধরা গলা, চোখে জল ঠোঁটের পাশে ফেনা।

তিষ্ঠ, মেরালাল তিষ্ঠ। তোমাকে বধ করে মহারায়ের যশ, কী আর বাড়বে, বল?

একমুঠো ভাংয়ে একুশটে মরিচ ফেলে, নিমের ঘোঁটনা নিয়ে মিশরজী বিকেল থেকে অভিনিবেশ সহকারে রগড়াচ্ছেন। এবার একঘটি জলে গুলে, দশবার উঁচুধারে এ লোটা ও লোটা করে, দুহাত ওপর থেকে গলায় ছেড়ে, কচ্‌কচ্‌ রবে গিলে ফেলবেন। তারপর দু'কান কষে পৈতে লেপ্‌টে ঘটি হাতে পুকুর দিশা হয়ে বসলেন, *পিঠের সাথে গামছা দিয়ে হাঁটু মোড়া বেঁধে।*

এই তো গীত ধরা দিল—বম্‌ বম্‌ ভোলা নাথ দিগম্বর কিয়্যা বিস্‌রায়েল ছি—তাল দিচ্ছে করতালি। ন্যাংটো ভোলা ভাংয়ের গোলা ভুলে আছো—সেই অনুযোগ।

মুখে বলে 'পাঁউ লাগি,' হাতে ছুঁলো মোটা ভুঁড়ি, সভাস্থ হচ্ছে দাহুরামড়র। গৃহে 'অথি' ঢুকে অশান্তি অশেষ।

বকুল তলার ঘাসের 'পর, কন্‌টিরঝার সান্ধ্য মজলিস। ধুতির ফাঁদে ধরা দিল, দোম্‌ড়ানো হাঁটু, ভাঁজ করা কনুই। 'চেটোয় শুখা,' চার আঙুলে তাড়া খেয়ে সাফা হচ্ছে। ডান হাত বাঁহাতে চালা হয়ে এবার মুখে পড়ে টাক্‌রায় টক্কর খেলো। ঠোঁটের অন্দরে পুঁটুলি হয়, জিবের তাড়ায়। দাঁতের ফাঁক দিয়ে 'চিক্‌' করে থুথু ছোড়ে, পিচ্‌কারি হেন।

—হম থি কঁউ পাঁড়ে বুদ্ধিক নিধান, ইসব থিকা হমর যজমান—দাবড়ে কাকে পথে বসিয়ে, দু'সের চিঁড়ে দৈ-র সাথে সেরটাক্‌ 'মধুব' সাবড়ে মজা করে এসেছেন, তাব ফলাও ব্যাখ্যান। আর ঢোল গমার পশু শূদ্র নারী, ইসব তাড়নকে অধিকারী—প্রাঞ্জল যুক্তি তার।

এদিকে পাড়া মাত করল সুভগী, দাহুর জায়া।

হঁরে মুন্‌সা, হম্‌ছি ডাইন, থুক্কো। চিৎহাতে চিৎ করা হাতের থাপ্পড় হাঁক্‌ড়ে, নৃত্যের তালে এগিয়ে এল বামা। কোঁচড়ে ধরে এসেছে মুঠো মুঠো আকাশ, দমকে দমকে তাই তুলে ছেড়ে দিচ্ছে, আকাশের ঐ পাড়ায়। গুষ্ঠীর খাদ্য তালিকা সম্পূর্ণ হতে নরক

উজোড়, কুল তিলকের সুখাদ্যের বরাদ্দ জানান দেয় ঘটা করেই। খাইয়ে, পরপারের ডাক ডাকাবে বলছে।

অদ্য রজনী শেষ রজনী যাব, আপন হাতে অনামুখে নুড়ো জ্বেলে আশ মেটাবে, মেটাও সুভগে। তবে ঐ যে কেষ্ট প্রাপ্তির আগে ভাগেই গুটিকয়েক পোড়া হাঁড়ি ও ড্যাক্‌রা মাথায় চূর্ণ করে পাঠাবার সাধ জেগেছে মনে, এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি। যাক্, সবার মাঝে সরব ঘোষণা, নিঃসন্দেহ তরে যাবে দাদুর। কপাল ভাল ও অঙ্গে সোহাগ সিন্দুর ধরে ছিল, গয়া গঙ্গা গদাধর হরি ঃ—পেয়ে যাচ্ছে সদ্য।

সুন্দরী বলে—সুন্দরারে, চাল বাড়ন্ত আজ, ভাঁড়ে মা ভবানী। চল, কারো বাগানে, তুঘোগা মকাই ছিঁড়ে আনি, পুড়িয়ে খেয়ে, রাত কাটাব।

এরাও জীবনযাত্রা চালিয়ে যাবে। উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি জীবন। কোথায় চলেছে, কে জানে।

নেপাল থেকে...

মনে রেখ, নেপাল পাহাড়ই নয়
সমান্তরালে তার বিস্তীর্ণ সমতল
সেঁটে আছে অন্য-অন্য বর্ণ-[illegible]
কৌশল। [illegible] এবং জনস[illegible]
অধ্যুষিত তরাই। তারাই [illegible]
আপন বৃত্তান্ত বলবে [illegible]

[illegible] আমাদের [illegible]
[illegible] হৃদয় [illegible]
[illegible]
[illegible] ছিল [illegible]
[illegible]
[illegible]
নেপালী [illegible]
[illegible]
কিন্তু [illegible] কথা। বিশ্বাস [illegible]
[illegible]
[illegible]

সঞ্জয় সেন